ঘরের ছবি।

গার্হস্থ উপন্যাস।

শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত।

১২৭ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, দরজিপাড়া হইতে
শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১২৭ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, "বসাক-প্রেসে"
শ্রীদীননাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

উৎসর্গ-পত্র।

মহারাজ কুমার

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর বাহাদুর

শ্রীচরণ কমলেষু।

ভক্তিভাজন,

বহুদিন হইতে আমি আপনাদের স্নেহে বৰ্দ্ধিত হইয়া আসিতেছি, বারি সিঞ্চনে যেমন লতা বৰ্দ্ধিতা হয়—আজ তাই "ঘরের ছবি" আপনার নামোল্লেখে উৎসর্গীকৃত হইল! আশা, স্নেহ-লতা যেন সম্যক্ প্রীতিতে পরিণত হইয়া আমায় ফল ফুলে শোভিত করে। ইতি।

বিনয়াবনত

শ্রীরাধানাথ মিত্র।

পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে সংসার, গৃহস্বামী আয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, গৃহিণী গৃহস্থালী রক্ষা করেন। সুখ-দুঃখ বিজড়িত সংসারে নিশ্চিন্ত ভাবে কাহারও দিন কাটে না; ব্রজেশ্বর পারিবারিক অভাব মোচনে উদ্যোগী রহিয়াছেন, আর তাঁহার গৃহিণী মায়াসুন্দরী সংসার ধর্ম্মের পরিচর্য্যা করিতেছেন।

রায় মহাশয় বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়াই পুত্ররত্নলাভ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীবৃদ্ধিও হইতে থাকে; এজন্য ব্রজেশ্বর জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাকান্তের অন্ন প্রাশনে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শ্বশুরালয় হইতেও ব্রাহ্মণ কায়স্থ অনেকগুলি ভদ্র সন্তানের সমাগম হইয়াছিল। ব্রজেশ্বর বাল্যাবস্থায় নিরাশ্রয় ভাবে কালযাপন করিয়া ছিলেন, শৈশব কালে মাতৃবিয়োগ ও পিতা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করায়, তিনি একমাত্র মাসীমাতা ঠাকুরাণীর আদর ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অভিভাবক অভাবে পঠদ্দশায় বালকের লেখা পড়া শিক্ষায় যে সকল ব্যাঘাত ঘটে, ব্রজেশ্বর সুচতুর হইলেও একেবারে সে বিঘ্ন রাশির কঠোর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, এজন্য লেখা পড়ায় তাদৃশ উন্নতি না হওয়াতেও অর্থ উপার্জ্জনের প্রতি তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল। নিঃস্ব ব্রজেশ্বর জল খাবারের পয়সা জমাইয়া পাঁচশত টাকার কোম্পানির কাগজ করিয়া ছিলেন। অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াও তিনি অর্থ সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। যখন বুঝিলেন যে, লেখা পড়ায় তাদৃশ কৃতিমান্ হইবেন না, অথচ সংসার ধর্ম্ম ও সকল দিক বজায় রাখিতে হইবে, তখন তিনি নিজ অবস্থার উন্নতি সাধনে সযত্ন হইলেন। সহায় সম্পত্তি বিহনে জগতে গণ্য মান্য হওয়া বড়ই সুকঠিন, ব্রজেশ্বর পিতৃধনে এককালে বঞ্চিত হইয়া-

ছিলেন, পরগৃহে বাস ও পরান্ন ভোজন করিয়া দুঃখে কষ্টে পাঁচ শত টাকা মাত্র তাঁহার সংগ্রহ হইয়াছে ; এই যৎসামান্য অর্থ লইয়া যে, কোন কাজ কর্ম্ম করিবেন, তাহাতেও তাঁহার সাহস ছিল না, অথচ পরাধীনতায় চিরবিদ্বেষ, অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিনযাপন অপেক্ষা অনশনে প্রাণত্যাগ তিনি শ্রেয়স্কর জানিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া রায় মহাশয় প্রায় দুই বৎসর কাল অর্থ সমাগম-উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন ; কিন্তু সকল শ্রম তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে স্থানীয় দুই এক জন ব্যবসায়ীরা চটের কারবার চালাইয়া বিশেষ সঙ্গতিপন্ন হইল দেখিয়া তিনি উক্ত ব্যবসা চালাইতে মনস্থ করেন ; কিন্তু সমকক্ষ ব্যক্তিরা যে ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন, সেরূপ ভাবে ব্যবসা চালান তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল, কারণ তাহাদিগের অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল, তাহারা প্রত্যেকেই বিশ পঁচিশ হাজার টাকা লইয়া কার্য্য চালাইতেছিলেন, এরূপ অবস্থায় প্রতিদ্বন্দী ভাবে কার্য্য করিতে তাঁহার চিত্ত ইতস্ততঃ করিতেছিল ; কিন্তু মন আর প্রবাহের গতিরুদ্ধ হইবার নহে।

অবশেষে ব্রজেশ্বর সেই সামান্য অর্থ লইয়া গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মূল ধন এককালে নিঃশেষিত হইয়া গেল, তিনি হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু একেবারে কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না ; জনৈক আত্মীয়ের নিকট স্ত্রীর যাবতীয় অলঙ্কার বন্ধক দ্বারা দ্বিগুণ অর্থ লইয়া নব উৎসাহে কার্য্য সাধনে উদ্যোগী হইলেন। এবার ভগবান তাঁহার প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিলেন, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সাবেক ক্ষতি-

পূরণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। যাঁহার নিকট হইতে ব্রজেশ্বর টাকা ধার লইয়া ছিলেন, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া সমোৎসাহে কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুকুমার প্রসব করিয়া অনাথ ব্রজেশ্বরের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। এই জন্যই তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রমাকান্তের অন্ন প্রাশনে বিশেষ সমারোহ করিয়াছিলেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, রায় মহাশয়ের ব্যবসায়ের ততই উন্নতি হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি প্রতিপালিকারই শরণাগত থাকিয়া সচ্ছন্দ মনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন, নিজ অবস্থার পরিবর্ত্তনজনিত তাঁহার মনে আদৌ ভাবান্তর হয় নাই। বৃদ্ধার কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় তিনি ব্রজেশ্বর-কেই পুত্রবৎ স্নেহ ও যত্ন করিতেন, রায় মহাশয় বিষয় কার্য্যে সংযত না হইলেও তাঁহার সুখ সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহের কথা; কারণ বৃদ্ধা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী। এক ব্রজেশ্বর ব্যতীত অন্যের তাহা উপভোগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

ব্রজেশ্বর মাসীমাতার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াও পিতা বা পিতৃ পরিবারবর্গের সংবাদ গ্রহণে কোন অংশেই ক্রটী করেন নাই, তিনি বৃদ্ধার একমাত্র নয়নপুত্তলি ছিলেন, বৃদ্ধার সংসারে দাসদাসীর অভাব ছিল না, তিনি একমাত্র ব্রজেশ্বরকে লইয়াই সংসারী হইয়াছিলেন, বৃদ্ধা তাঁহাকে শৈশব অবস্থায় সদাসর্ব্বদা বেশভূষায় সজ্জিত রাখিতেন, দেব-সেবা ও ব্রজেশ্বরের লালনপালন ব্যতীত তাঁহার আর অন্য কার্য্য ছিল না। ব্রজেশ্বরের স্ত্রৈণ পিতা ব্রজেশ্বরকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিয়া নববধূর প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিলেন, ভগ্নীপতির ঈদৃশ কুৎসিৎ প্রকৃতি দেখিয়া বৃদ্ধার তাঁহার প্রতি অভক্তি

ও বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তবে তিনি তাঁহার আদরের বস্তু ব্রজেশ্বরের পিতা, এজন্য সময়ে সময়ে তিনি বৃদ্ধার বাটীতে উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধা তাঁহাকে সমাদরের কোন ত্রুটী করিতেন না। এক দিবস ব্রজেশ্বরের পিতা বৃদ্ধার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে একজন ভৃত্য আসিয়াছিল, বৃদ্ধা ভৃত্যসহ ভগ্নীপতিকে উপস্থিত দেখিয়া সন্দিগ্ধা হইলেন,ব্রজেশ্বরের বয়ঃক্রম তখন তিন বৎসর মাত্র; বালককে ভৃত্যের হস্তে দিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরঘরের কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন; এদিকে বালকের পিতা সুযোগ বুঝিয়া ভৃত্যের নিকট হইতে তাহাকে স্বয়ং লইয়া বাটী হইতে নিক্রান্ত হইলেন, বৃদ্ধা এ সংবাদ কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্রজেশ্বর অবোধ শিশু, ভাল মন্দ কিছুই জানে না, পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু নরপিশাচ ব্রজেশ্বরের পিতা সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে পাইয়া ভৃত্যের সহায়তায় সন্নিকটস্থ দোকান হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনয়ন করতঃ তাহাকে আহার করিতে দিয়া, তাহার গ্রীবাদেশ হইতে হার ছড়া খুলিয়া লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে ব্রজেশ্বরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। বালক আপন মনে একাকী বসিয়া রহিল, পরক্ষণে নিকটে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা দেবার্চ্চনার পরেই ব্রজেশ্বরের অনুসন্ধান করিলেন, বালককে দেখিতে পাইলেন না; তাহার অদর্শনেই তিনি ব্রজেশ্বরের জীবন আশঙ্কা করিলেন। আদেশ মাত্র চতুর্দ্দিকে দাসদাসী ছুটিল, বৃদ্ধা উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। পূজান্তে জলগ্রহণ করেন, সে দিবস তাঁহার কিছুই হইল না; বহুক্ষণ পরে জনৈক ভৃত্য ব্রজেশ্বরকে লইয়া বৃদ্ধা সমীপে উপস্থিত হইল, বালকের নয়ন যুগল হইতে অবিরল

ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতেছে, ভয় ও বিস্ময়ে ব্রজেশ্বরের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বালককে রোদন করিতে দেখিয়া সত্বর ক্রোড়ে লইলেন এবং মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, পরক্ষণে ব্রজেশ্বরের গলায় হার নাই দেখিয়া অনুতপ্তা হইলেন; কিন্তু ভৃত্য বা পরিচারিকা কাহাকেও সে কথা কিছুই ব্যক্ত করিলেন না, বৃদ্ধা মনে মনে স্থির জানিলেন যে, দুষ্টমতি ব্রজেশ্বরের পিতারই এই কাজ। বৃদ্ধা প্রমুখাৎ হার চুরির কথা প্রকাশ না হইলেও দাসদাসী সকলেই বুঝিতে পারিল যে, বালকের হার ছড়া খোয়া গিয়াছে, তাহারা এতাবৎকাল বিশ্বস্তভাবে গৃহিণীর কার্য্য করিয়া আসিতেছে, বৃদ্ধা তাহাদের কার্য্যে কদাচ সন্দেহ করেন নাই, যদিও বৃদ্ধা তাহাদিগকে কোন কথা বলিলেন না বটে; কিন্তু তাহারা সকলেই মনে মনে অপ্রতিভ হইল। বিশেষতঃ যে ভৃত্যকে ব্রজেশ্বরের তত্ত্বাবধারণে বৃদ্ধা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা সেই ব্যক্তি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইল। ব্রজেশ্বরের গলা হইতে হার চুরি যাওয়া অবধি বৃদ্ধার ভগ্নীপতির প্রতি বিশেষ ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। ব্রজেশ্বরের পিতা এই দুষ্কার্য্যের মূল, তিনিও সেইদিন হইতে লোক লজ্জায় ব্রজেশ্বরকে দেখিবার ছলে বৃদ্ধার বাটীতে প্রবেশ করিতে আর সাহসী হন নাই।

ব্রজেশ্বর এক্ষণে কৃতিমান পুরুষ হইয়াছেন, যদিও মাসী মাতার অন্নে এখনও প্রতিপালিত হইতেছেন, তথাচ তিনি স্বোপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসেই সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন। যে পিতা তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যাঁহার কর্তৃক তিনি বৃদ্ধা প্রদত্ত স্বর্ণহারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, পিতৃপরায়ণ ব্রজেশ্বর

এক্ষণে সেই পিতা ও পিতৃপরিবারবর্গের দীনাবস্থা জ্ঞাত হইয়া বিচলিত হইলেন। বয়োপ্রাপ্তে ব্রজেশ্বর মাসী মাতার বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতে ছিলেন, বৃদ্ধার সন্তান সন্ততি না থাকায় তিনি যুবককেই পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিতেন, ব্রজেশ্বরের মনোগত অভিপ্রায় যে পিতা মাতা ভগ্নী প্রভৃতিকে তিনি নিকটে রাখেন; কিন্তু বৃদ্ধার অনুমতি ব্যতিরেকে ব্রজেশ্বর সে কার্য্য করিতে পারেন না, কথায় কথায় বৃদ্ধা পালিত পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে সম্মতি দিলেন। ব্রজেশ্বর পিতা ও পিতৃপরিবারবর্গকে মাসী মাতার বাটীতে আনিয়া পরম সুখে মনের আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। রমাকান্তের অন্ন প্রাশনের পূর্ব্বেই ব্রজেশ্বরের পিতা পরিবারবর্গ লইয়া পুত্রের নিকটে আসিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা ব্রজেশ্বরকে লইয়া সুখী হইয়াছিলেন, ব্রজেশ্বর তাঁহার নয়নের মণি, অন্ধের যষ্টি, তাঁহার বিষয়সম্পত্তি কিছুরই অভাব নাই, ভোগ দখলকারীর অবর্ত্তমানে সমস্তই পরহস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু এক্ষণে ব্রজেশ্বর সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, মাসীমাতার পরলোক গমনের পর তিনিই তৎসমুদায়ের উত্তরাধীকারী হইবেন।

কিন্তু বিধাতার নির্দ্দিষ্ট লিপি কখন কাহাকে কোন পথে লইয়া যায়, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ব্রজেশ্বর প্রকৃতপক্ষে পিতৃদেব অপেক্ষা মাসীমাতার সেবা শুশ্রূষা করেন, তিনি ভিন্ন গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহাকেই একমাত্র জননী বলিয়া জানিয়াছেন, বৃদ্ধারও তাঁহার প্রতি পুত্রস্নেহ জন্মিয়াছে, তথাচ ঘটনাচক্রে এ ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিল। অভাগা ব্রজেশ্বর পিতৃসেবায় ও পিতৃপরিবারবর্গের লালনপালন

কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জননী সদৃশা বৃদ্ধার নিকট অপরাধী হইলেন। প্রকৃত পক্ষে ব্রজেশ্বর বৃদ্ধার ক্রোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া কুক্ষণে মাসীমাতার কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন, বৃদ্ধার তাহা সহ্য হইল না; ব্রজেশ্বর পরক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, মাসীমাতা তাঁহাকে অকারণ তিরস্কার করেন নাই, তাঁহার পিতৃপরিবারবর্গই এই মনোমালিন্যের মুখ্য কারণ। তিনি নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া বৃদ্ধার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কোমলহৃদয়া ব্রজেশ্বরের মুখচুম্বন করিয়া বিগত ঘটনাবলী সমস্ত বিস্মৃত হইলেন; কিন্তু এ ভাবে আর বহু দিবস গত হইল না, পুনরায় বৃদ্ধা ব্রজেশ্বরের সতর্কতা কারণ ভর্ৎসনা করিলেন। ব্রজেশ্বর এক্ষণে পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, দিন দিন তাঁহার ধনসম্পত্তিও বৃদ্ধি হইতেছে, এবার বৃদ্ধার উপদেশ বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে এককালেই প্রবেশ করিল না, তিনি বৃদ্ধাকে অযথা কয়েকটী প্রত্যুত্তর করিলেন এবং তদ্দণ্ডেই ব্রজেশ্বর স্বীয় পরিবারবর্গকে লইয়া সন্নিকটস্থ এক খানি বাটী ভাড়া করিলেন। যুবকের ব্যবহারে বৃদ্ধার প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগিল। তিনি জানিতেন যে, ব্রজেশ্বর কদাচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, অকস্মাৎ ব্রজেশ্বরের এরূপ মতি গতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া তিনি নিস্তব্ধভাবে থাকিলেন, ব্রজেশ্বরের কার্য্য সম্বন্ধে আদৌ হস্তারক হইলেন না।

সংসারে পুনঃ পুনঃ বাদবিসম্বাদ ঘটিতেছে, পিতৃপরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই সব গোলযোগ চুকিয়া যায়, আর কোন ভাবনা থাকে না, এই ভাবিয়াই ব্রজেশ্বর স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে,

মাসীমাতা তাঁহার অদর্শনে অবশ্যই ব্যথিতা হইবেন, ক্রোধবশে যদিও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু স্নেহ মমতায় সে ভাব সত্বরই লোপ পাইবে। যুবক মনে মনে এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পূর্ব্বমত বৃদ্ধাসমীপে নিজ অপরাধ স্বীকার করণে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এ দিকে বৃদ্ধা স্থির করিলেন যে, ব্রজেশ্বর তাঁহার গর্ত্তজাত সন্তান নহেন, তিনি এত দিন তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিলেন, এক্ষণে ব্রজেশ্বর উপায়ক্ষম হইয়াছেন, দশজনকে প্রতিপালন করিবার তাঁহার ক্ষমতা হইয়াছে, এখন কেন সেই ব্রজেশ্বর আর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবে? পর কখনও আপনার হয় না, তিনি যে এতকাল তাঁহাকে লালনপালন করিলেন, লেখাপড়া শিখাইলেন, সকলই তাঁহার ব্যর্থ হইল। কিছুদিন পরে যদিও ব্রজেশ্বর ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তথাচ তাঁহাকে লইয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপনের পক্ষে বৃদ্ধার ব্যাঘাত জন্মিল, তিনি ব্রজেশ্বরকে যেভাবে এতকাল দেখিয়া আসিয়াছেন, এখণ হইতে আর তাঁহার ব্রজেশ্বরের প্রতি সে ভাব রহিল না।

কুক্ষণে ব্রজেশ্বর মাসীমাতার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধা অবশ্যই তাঁহার অদর্শনে ব্যথিতা হইবেন; কিন্তু যুবকের সে আশালতা এককালে উন্মুলিত হইল, কারণ ব্রজেশ্বরের মাসীমাতা ঠাকুরাণী দীনবন্ধু নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তানকে পূর্ব্বেই ভিক্ষাপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর যদবধি মাসীমাতার নিকটে ছিলেন, ব্রাহ্মণ যদিও আবশ্যকমত অর্থ সাহায্য পাইতেন, কিন্তু ব্রজেশ্বরের ভয়ে সকল কথা বৃদ্ধাকে জানাইবার তাঁহার বিশেষ সুবিধা বা সাহস হইত না। এক্ষণে ব্রজেশ্বর মনোবিবাদ কারণ মাসীমাতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন,

হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সেই ব্রাহ্মণ সকল কথা বৃদ্ধার নিকট ব্যক্ত করিবার সুবিধা পাইল, অথচ দিন দিন দীনবন্ধু যে ভক্তিভাবে বৃদ্ধার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, তাহাতে ব্রজেশ্বরের মাসীমাতার স্নেহ যত্ন উত্তরোত্তর ভগ্নীপুত্রের বিনিময়ে দীনবন্ধুর প্রতিই সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বর জ্ঞানবান্ পুরুষ, মাসীমাতার গৃহ ত্যাগ করায় যে, দীনবন্ধুর সুবিধা হইয়াছে, তাহা তিনি সম্যক বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তিনি অভিমান ভরে এককালে নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়াছেন। বৃদ্ধার অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল; অধিকন্তু এক্ষণে তিনি উপায়ক্ষম হইয়াছেন, দশজনকে প্রতিপালন করিবার শক্তি ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছেন, এ সময়ে তিনিই বা কেন পূর্ব্বমত মাসীমাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবেন? দুষ্টা সরস্বতী ব্রজেশ্বরের স্কন্ধে চাপিল।

সময় স্রোতে দীনবন্ধু সপরিবারে বৃদ্ধার গলগ্রহ হইল। ব্রজেশ্বরের ভাড়া বাটীতেই দিনাতিপাত হইতে লাগিল। মাসীমাতার গৃহ হইতে আসিবার কালে ব্রজেশ্বরের সহধর্ম্মিণী মায়াসুন্দরী পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পতিগৃহে আসিয়া তিনি বৃদ্ধার সহিত স্বামীর মনান্তর সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বিশেষ ব্যথিতা হইলেন; কিন্তু পতিব্রতা তৎকালে যুবতী মাত্র, স্বামী যে কার্য্য করিয়াছেন, তিনি তাহার কিরূপে অন্যথা করিবেন? মায়াসুন্দরী বৃদ্ধাকে সাতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, তিনি হরিহরপুরে আসিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহিত যাহাতে স্বামীর মনোমিলন হয়, তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পিতৃপরিবারবর্গের বৈষম্য কারণ ব্রজেশ্বরের মাসীমাতা ঠাকুরাণীর সহিত বিবাদ হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তিনি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঁচ সাত বৎসর ব্যবসা চালাইয়া ব্রজেশ্বর বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার মাসীমাতার সহিত এখনও মনোমিলন হয় নাই। অর্থের অভাবে তিনি পরের গলগ্রহ হইয়াছিলেন, এক্ষণে কমলাদেবীর সুদৃষ্টিতে তিনি দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছেন। হরিহরপুরে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি দাঁড়াইয়াছে, সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্ভ্রম করে। মাসীমাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার পর প্রথমতঃ লজ্জাভয়ে বহু দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু এখন ব্রজেশ্বর সপ্তাহে সপ্তাহে প্রতিপালিকার গৃহে যাতায়াত করেন, বৃদ্ধার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হয়। ব্রজেশ্বর বৃদ্ধার অন্নে লালিত পালিত হইয়াছেন, ক্রোধভরে তাঁহার বাটী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন বৃদ্ধা সময়ে তাঁহাকেই আপনার ভাবিয়া গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু ব্রজেশ্বরের প্রতি বিধাতা বিমুখ হইয়াছেন, দীর্ঘকাল উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ না থাকায় বৃদ্ধার মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বিষয় সম্পত্তি সমস্তই এক্ষণে তিনি হস্তান্তরিত করিয়াছেন, যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি তাঁহার দেবর পুত্র আইন মত লেখাপড়া

করিয়া লইয়াছেন, অস্থাবর দ্রব্য সকল সুচতুর দীনবন্ধু সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছে।

ব্রজেশ্বর মাসীমাতার সহিত সাক্ষাতে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়াই এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ব্রজেশ্বর তাঁহারই অনুগ্রহে জীবন লাভ করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখিয়াছেন, বিষয় কর্ম্ম করিতেছেন; মাসীমাতা তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেও তিনি ধর্ম্মানুসারে তাঁহার সেবক, তিনি সে ধর্ম্মও রাখিয়াছিলেন। ক্রোধভরে বৃদ্ধার বাটী হইতে চলিয়া আসায় তাঁহার অধর্ম্ম হইয়াছিল, বৃদ্ধার একবিন্দু নয়নজল তাঁহার পক্ষে অমঙ্গলকর, বুদ্ধিমান ব্রজেশ্বর এ সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উপস্থিতে ব্রজেশ্বরের পয়সার অভাব ছিল না, তবে কোন অংশে বৃদ্ধার কোন কষ্ট না হয়, তাঁহার অন্তিমকালে ব্রজেশ্বর উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সংকার করেন, এই মাত্র ব্রজেশ্বরের বাসনা।

মায়াসুন্দরী পিতামাতার এক মাত্র কন্যা, বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তি না হইলেও দেবীগ্রামে মায়াসুন্দরীর পিতার বিশেষ মান সম্ভ্রম ছিল। অন্য কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় জনক জননী উভয়েই মায়াসুন্দরীকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় নিকটে রাখিতেন, নয়নের অন্তরাল করিতে প্রায়ই তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন না। তবে কন্যার যে দিন বিবাহ দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের আর দুহিতায় অধিকার নাই। সংসারের সকলেই বর্ত্তমান সত্ত্বেও ব্রজেশ্বর সহায় হীন, জন্মদাতা পিতা তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি উপযুক্ত হইয়াছেন, অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, কর্ত্তব্য বিবেচনায় পিতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে লইয়া সংসারী হইয়াছেন। এই

ব্রজেশ্বরের অহোরাত্র পরিশ্রমেও বিরাম নাই. তিনি উপার্জ্জন-চিন্তাস্রোতে মগ্ন থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন, পুত্র-কলত্রাদি পরিবারবর্গ সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে। ইহাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সংসারের শোভা সহধর্ম্মিণী; কিন্তু মায়াসুন্দরী পিত্রালয়ে থাকিলে তাঁহার ঘোরতর অভাব উপস্থিত হয়, যদিও বিমাতা ও ভগ্নী ব্রজেশ্বরের যথাযথ আহারাদির পরিচর্য্যা করেন; তথাপি তাহাতে তাঁহার মন উঠে না; অভাব বোধ হয়।

মায়াসুন্দরী স্বামীর মাসীমাতার নিকট যেরূপ আদর যত্ন পাইতেন, স্বয়ং সংসারের গৃহিণী হইয়াও সে সুখে বঞ্চিতা রহিয়াছেন; শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর, ননদ সকলেই তাঁহাকে যথাযথ ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু যুবতীর সে সমস্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। পতিগৃহে আসিয়া সতত তাঁহাকে সতর্কভাবে থাকিতে হয়, এজন্য যুবতীর মনে সুখের লেশমাত্রও নাই। এক্ষণে তিনি পুত্র কন্যার জননী হইয়াছেন, পতির সংসার বুঝিয়া লইবার তাঁহার অধিকার দাঁড়াইয়াছে, তথাচ তাঁহাকে যেন সর্ব্বদাই শঙ্কিত ভাবে থাকিতে হয়। ব্রজেশ্বরের কষ্টের লাঘবঃ কারণ মায়াসুন্দরীকে পতিগৃহে আসিতে হয়, কিন্তু তিনি আদৌ মনের স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারেন না, উপস্থিত কোন গোলযোগ না থাকিলেও তিনি নিয়ত ভাবী বিপদের আশঙ্কা করেন, পতিগৃহে দিনযাপন তাঁহার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্রজেশ্বর চটের ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেন। তিনি লোক-জনকে অগ্রিম টাকা দিয়া চট প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ সওদাগরগণকে বিক্রয় করিতেন। তখন আমেরিকায় চটের কল প্রস্তুত হয় নাই, এজন্য উক্ত কারবারে

বিশেষ লাভ ছিল, ব্যবসায়ীগণ উক্ত কারবারে বিশেষ লাভও করিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বরও সামান্য মূলধন লইয়া এই ব্যবসায় নিযুক্ত হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী কাহারও প্রতি চিরসুপ্রসন্না নহেন, আমেরিকায় চটের কল স্থাপিত হইবামাত্র মহাজনগণ উক্ত ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন, অগত্যা সকলেই উক্ত কারবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেশ্বরেরও অদৃষ্ট ভাঙ্গিল।

এদিকে মায়াসুন্দরীর পিতা মিত্রজা মহাশয় পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া কর্ম্মস্থল কলিকাতায় এক খানি বাটী খরিদ করিয়াছিলেন, কয়েক মাস তথায় বাস করিয়াই তিনি পীড়িত হইলেন, দিন দিন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অবশেষে তিনি ব্রজেশ্বরকে পত্র লিখিলেন, ব্রজেশ্বর ব্যতীত তাঁহার তত্ত্বাবধারণের আর কেহ নাই, তিনি শ্বশুর মহাশয়ের উৎকট পীড়ার সংবাদ পাইবা মাত্র সপরিবারে সশব্যস্তে কলিকাতার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রজেশ্বর শ্বশুরালয়ে পৌছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার শ্বশুর মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী মৃত পতিকে ক্রোড়ে করিয়া ধূলায়ধূসরিত অঙ্গে রোদন করিতেছেন, পল্লীস্থ দুই চারিজন স্ত্রীলোক তাঁহার রোদনে যোগদান করিয়াছেন। মায়াসুন্দরীর বড় সাধ ছিল, বুক বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন যে, তিনি পিতার সেবা শুশ্রূষা করিবেন, অভাগিনীর মনের আশা, মনেই বিলীন হইল, তিনি মৃত পিতার পদতলে পড়িয়া "বাবা গো! কোথায় গেলে গো! একবার কথা কও গো" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। জননীর অশ্রুধারা সম্বরিত হইলেও মায়াসুন্দরী নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। পিতার অন্তিম সময়ে সাক্ষাৎ হইল না, তিনি যে তাঁহাকে এত আদর যত্ন করিয়া মানুষ করিয়া-

ছিলেন, তাঁহার শেষ দশায় মায়াসুন্দরী কিছুই করিতে পারিলেন না, ইহা অপেক্ষা অভাগিনীর আর দুঃখ কি ?

বিলাপ পরিতাপে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। ব্রজেশ্বর শ্বশুরেব অন্তেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগী হইলেন। যথা সময়ে পল্লীস্থ কয়েক জন ভদ্রলোকের সহায়তায় ব্রজেশ্বর শ্বশুরের সৎকার কার্য্য শেষ করিয়া আসিলেন। মাতা ও কন্যা তখনও উভয়ে রোদন করিতেছেন, সে কান্নার বিরাম নাই। প্রতিবাসিনীগণ একে একে সকলেই আসিয়া সময় মত তাঁহাদের সান্ত্বনা করিতে-ছিলেন। রমাকান্ত ও চারুবালা, মাতা ও মাতামহীর শোচনীয় ভাব দেখিয়া উভয়েই কাঁদিতেছিল, তবে তাহারা অতি শিশু; কি যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি তখনও জন্মে নাই। তাহারা ক্ষুধায় আহার পাইয়াছে, মাতৃক্রোড়ে উভয়ে বহুক্ষণ স্থান পায় নাই, মাতৃ ক্রোড়ে স্থান পাইবার জন্যই তাহা-দের এরূপ রোদন, তাহাতে সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহারা অপেক্ষাকৃত অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু কেন যে মাতা এত বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছেন, মাতামহীর আদরের সামগ্রী হইয়াও এতাবৎকাল কেন যে সাদর সম্ভাষণে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর অন্য অভিভাবক আর কেহই ছিল না, মায়াসুন্দরী তাঁহার একমাত্র সন্তান। ব্রজেশ্বর বুঝিলেন যে, তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ যেরূপ কর্ত্তব্য, তদনুরূপ শ্বশ্রূঠাকুরাণীরও ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইল, অথচ শ্বাশুড়ীর অবর্ত্তমানে শ্বশুরের যাবতীয় ধন সম্পত্তির তাঁহার গৃহিণীই একমাত্র অধিকারিণী হইবেন। শ্বাশুড়ীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাকে ভাবিত হইতে হইবে,

না। শ্বশুর যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, অনায়াসেই তাহাতে তাঁহার সুখ সচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইবে, তবে একাকিনী রমণী কি প্রকারে বাটীতে থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ উপস্থিত যে শোক তাপ পাইয়াছেন, তাহার কতক পরিমাণে লাঘব করিতেই অন্ততঃ পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে শ্রাদ্ধ শান্তি ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য সমাপ্ত হইলে, ব্রজেশ্বর একবার হরিহরপুরে যাইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি পুত্র কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে একাকী তথায় যাইয়া দুই দশ দিনের মধ্যে বিষয় কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিবার কথা হইল। তিনি বুঝিলেন যে, রমাকান্ত চিররুগ্ন, চারুবালার স্বাস্থ্যও ভাল নহে, তিনি স্বয়ং পুত্র কন্যার ঔষধাদি পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করেন, এজন্য দীর্ঘকাল তাহাদিগকে তাঁহার নয়নের অন্তরালে রাখিলে হয়ত তাহাদের অসুখের বৃদ্ধি হইতে পারে। তাহাতে মাতা দুইটী রুগ্ন বালক বালিকাকে লইয়া কিরূপেই বা দিন যাপন করিবেন, এজন্য অগত্যা তাঁহাকে সত্বরেই আসিতে হইবে।

চটের কারবারে ব্রজেশ্বরের প্রতি কমলার শুভদৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি নিরাশ্রয় নিঃস্ব হইয়াও ব্যবসায়ে দশটাকা সংস্থান করিয়াছিলেন। আমেরিকায় কল খোলা হইলে কলিকাতার সওদাগরগণ চটের রপ্তানি বন্ধ করায় চটের ব্যবসায় যখন মন্দা পড়িয়া আসে, ঠিক সেই সময়েই ব্রজেশ্বরের শ্বশুরের মৃত্যু হয়। তিনি ভাবিলেন যে, পড়্‌তা খারাপ পড়িয়াছে, এ সময়ে বিষয়ান্তরে হস্তক্ষেপ করিলেও ক্ষতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, বহুকষ্টে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, এক্ষণে বিশেষ সতর্ক না হইলে সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় হইতে পারে।

ব্রজেশ্বর হরিহরপুরে আসিয়া একেবারে ব্যবসা তুলিয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিলেন; কিন্তু কারিকরবর্গের হস্তে অনেকগুলি টাকা দাদন দেওয়া রহিয়াছে, সহসা তিনি ব্যবসা বন্ধ করিতেছেন, একথা একবার প্রকাশ হইলে তাঁহার এক পয়সাও আদায় হইবার সম্ভবনা নাই, তিনি মনোগত অভিপ্রায় মনেই রাখিলেন; কিন্তু দেনদারদিগের নিকট টাকার জন্য বিশেষ পীড়ন আরম্ভ করিলেন। ভদ্র অভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ভাল মন্দ লোক থাকে, ব্রজেশ্বর এককালে ব্যবসা তুলিয়া না দিয়া যৎসামান্য ভাবে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে শঠের সংখ্যাই অধিক, তাহারা ব্রজেশ্বরের দুঃসময় দেখিয়া সুযোগ বুঝিয়া টাকা দিতে বা কার্য্য চালাইতে অনেকেই গোলযোগ করিতে লাগিল, তবে যাহাদের অল্পমাত্রও ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, তাহারা প্রভুর আদেশমাত্রেই কায়িকশ্রম দ্বারা ঋণ পরিশোধে উদ্যোগী হইল। ব্রজেশ্বর বুঝিলেন যে, ভাঙ্গা হাট পাইয়া কারিকরবর্গের অনেকেই তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছে, যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তাহার নিকট হইতে আদায় হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; তবে যে সকল কার্য্য শেষ না হইলে তাঁহাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে, অথবা যাহাতে তাঁহার ছড়ান টাকার কতক উপায় হয়, সেই হিসাবে কাজ চালাইতে লাগিলেন। বাজারে যে জিনিষের কাটতি নাই, দিনে দিনে তাহার আদরও কমিয়া যায়। ব্রজেশ্বর বুঝিলেন যে, ব্যবসা চালাইলে সমধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে, তিনি দাদনের টাকা আদায় উদ্দেশে কাজ চালাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন অর্থব্যয় না করিলে সাবেক টাকা আদায় হইবার আর সম্ভাবনা নাই, অথচ বাজারের

যখন খরিদদার নাই, কেন অকারণ তিনি আর জড়িত হইয়া পড়িবেন? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এককালে ব্যবসা তুলিয়া দিলেন। ব্যবসার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই কারিকরগণ অর্থদায় হইতে মুক্তিলাভ করিল; ব্রজেশ্বর ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন।

ব্রজেশ্বরের জীবনসর্ব্বস্ব রমাকান্ত ও চারুবালা, কয়েক দিবস মাতুলালয়ে রহিয়াছে, মায়াসুন্দরীও পিতৃগৃহে দিনাতিপাত করিতেছেন। এদিকে পিতা, বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাভগ্নী লইয়া যে নূতন সংসার পাতিয়াছেন, তাহারও বন্দোবস্ত না করিলে ব্রজেশ্বরের ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পিতার সংসার নির্ব্বাহ কারণ, মাসিক ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিলেন। উপস্থিতে ব্রজেশ্বরের কাজ কর্ম্ম নাই, তাঁহাকে সঞ্চিত অর্থ হইতে সকল দিক রক্ষা করিতে হইবে, অগত্যা বৃদ্ধ পরিবারবর্গসহ স্থানান্তরিত হইলেন। ব্রজেশ্বর, বর্ত্তমানে শ্বশুরালয়ে দিন যাপনই সাব্যস্ত করিলেন, তথায় পিতৃপরিবারবর্গ লইয়া এককালে প্রবেশ যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়াই তিনি অনুরূপ বন্দোবস্ত করেন।

হরিহরপুরে ব্রজেশ্বরের বাস উঠিল, একমাত্র চিন্তা তাঁহার মাসীমাতা ঠাকুরাণীর কারণ। বৃদ্ধা তাঁহাকে লালনপালন করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহে ব্রজেশ্বর আজ দশজনের মধ্যে একজন হইয়াছেন, এ অন্তিম সময়ে ব্রজেশ্বরের বৃদ্ধার নিকটে থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিও ঘটনাচক্রে ও বিধির বিপাকে বৃদ্ধার সহিত তাঁহার বাদবিসম্বাদ হইয়াছিল, তাহাতে ব্রজেশ্বরেরই ক্ষতি হইয়াছে, তিনি মাসীমাতার যাবতীয় বিষয়ে বঞ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে মাসীমাতার আদর যত্ন এখনও অঙ্কিত রহিয়াছে, তিনি বিষয়ে বঞ্চিত হইলেও বৃদ্ধার যাহাতে

সদ্গতি হয়, মৃত্যু সময়ে স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকিয়া নিজে যাহাতে সেবা শুশ্রূষা করিতে পারেন, ইহাই ব্রজেশ্বরের একমাত্র কামনা। তিনি হরিহরপুর ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে মাসীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন, মাতা পুত্রের সুখ দুঃখের অনেক কথা হইল; ব্রজেশ্বর বৃদ্ধার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আসিলেন যে, তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি হরিহরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, কার্য্যগতিকে ক্ষণবিলম্বও করিবেন না, তদ্ব্যতীত সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহার সংবাদ লইয়া যাইবেন।

দীনবন্ধু এক্ষণে বৃদ্ধার একমাত্র অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তিনি পরিবারবর্গ লইয়া সেই বাটীতেই বাস করিতেছেন। ব্রজেশ্বর মাসীমাতার যাবতীয় বিষয়ে বঞ্চিত হইলেন, ব্রাহ্মণ যে তাহার মূল কারণ, তাহা ব্রজেশ্বরের অবিদিত ছিল না। কিন্তু ব্রজেশ্বর দীনবন্ধুকে বাল্যকালাবধি জ্যেষ্ঠের মত সম্মান ও ভক্তি করিতেন, এখনও তিনি সে ভাবের ভাবান্তর করেন নাই। মাসীমাতার বাটী পরিত্যাগ কালে তিনি দীনবন্ধুর দুইটী হস্ত লইয়া সাদরে ধারণ করতঃ কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "দীন দাদা! মা রহিলেন, আমি অতি হতভাগা, তাই এ অবস্থায় মাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল, তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, যেন মার অসুখের সূত্রপাতেই আমি সংবাদ পাই, মার অনুগ্রহে আমি জীবন পাইয়াছি। অন্তিমে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা পরিচর্য্যা করিলেও অভাগা হৃদয়ে কতক শান্তি পাইবে! ভাই দীন দাদা, আমার কথা মনে রাখিও,—আমায় ভুল না, মার যেন কোন কষ্ট না হয়, আমার এই তোমার নিকট ভিক্ষা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বর এক্ষণে কলিকাতায় বাস করিতেছেন, শ্বশুর অবর্ত্ত-মানে শ্বাশুড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ যাবতীয় ভার তাঁহার স্কন্ধেই অর্পিত হইয়াছে, তিনি শ্বশুরের ভদ্রাসন খানির সংস্কার ও দ্বিতলে কয়েকটী গৃহ প্রস্তুত করাইয়া বাসোপযোগী করিয়া লই-য়াছেন। চটের কারবার বন্ধ হইয়াছে, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ব্যবসায় অনুরাগ ছিল, এজন্য কখনও একপয়সা অপব্যয় করেন নাই; পয়সার আদর তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। সঞ্চিত অর্থের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল, সময়ে তাহা নিঃশে-ষিত হইতে পারে, তাহাতে তাঁহার আর একটী কন্যা সন্তান হইয়াছে, দিন দিন পোষ্য বাড়িতেছে; কিন্তু আয় এককালে কমিয়া গিয়াছে। একমাত্র কোম্পানীর কাগজের সুদে সংসারের সকল অভাব মোচন হইতে পারে, এরূপ সঙ্গতিপন্ন তিনি এখনও হন নাই, এ কারণ তিনি কতক টাকা মহাজনী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু সময় মন্দ হইলে সকল দিকেই গোলযোগ বাধিয়া থাকে। তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের একখানি বাটী বন্ধক রাখেন, কিন্তু সে বাটীটীর গোলযোগ থাকায় এককালে তিন চারি সহস্র মুদ্রা ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। ব্রজেশ্বরের হস্তে কখনও ক্ষতি

হয় নাই, যদিও কারবারের সূত্রপাতে তাঁহার লোকশান্ হইয়াছিল, তথাচ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সময়ে তাহা পূরণ হইবে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি দালালের কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন, অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া দারুণ অন্তর্জ্বালায় তিনি দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। নিজে উপায় করিয়াছেন, নিজের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সময়ে তাঁহার মূলধন গৃহে আসিবে, এইরূপ আশার ছলনায় নিশ্চিন্ত হইলেন, আর ব্যয়াধিক্য প্রযুক্ত যে কোন উপায়ে হউক আয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন।

ব্রজেশ্বর বিনয়ী, সভ্য ও নম্র প্রকৃতিবিশিষ্ট, স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি শূন্য হইয়াও তিনি পরোপকার করিয়া থাকেন, তাঁহার সদ্‌গুণে পল্লীস্থ সকলেই বাধ্য। তিনি শ্বশুরালয়ে কয়েক মাস বাস করাতেই সকলের সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্যতা জন্মিল, সদালাপ ও সদাচারে তিনি সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। সংসারিক খরচ পত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় ব্রজেশ্বর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উপায় উদ্ভাবনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি এতাবৎকাল অন্যের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে, দিন দিন সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হইতেছে, অথচ সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। ব্রজেশ্বর ভাবিয়াছিলেন যতদিন না সুবিধা হয় বন্দকী কাজ করিয়া সংসার যাত্রা চালাইবেন; কিন্তু অকস্মাৎ চারি সহস্র মুদ্রা লোকশান হওয়ায় সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না, অগত্যা পরিবারবর্গকে প্রতিপালন জন্য তাঁহাকে মূলধনে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। দ্বারকা ব্রজেশ্বরের যত্নের সামগ্রী, তিনি অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য

করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, টাকার মহিমা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন, তবে যাহা না করিলে নয়, কিরূপে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবেন? এক্ষণে তিনিই একমাত্র সংসারের অভিভাবক, সকল দিক রক্ষা করিয়া তাঁহাকেই গৃহধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইবে, তাহাতে ব্রজেশ্বরের সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, তিনি তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন না হইলেও লোকে তাঁহাকে বিষয়ী বলিয়া জানে, পরামর্শ লয়। বিচক্ষণ ব্রজেশ্বর সংসারের দৈনন্দিন অভাবে বিশেষ ভারাক্রান্ত ও ভাবিত হইলেন। অবশেষে রেড়ির কল করিয়া তৈল ব্যবসায় নিযুক্ত হইলেন। পল্লীস্থ ভাড়াটিয়া গোবর্দ্ধন দত্ত নামক এক ব্যক্তি তাঁহার শূন্য অংশীদার জুটিল। গোবর্দ্ধনের সহিত ব্রজেশ্বরের পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় কিছুই ছিল না, ব্রজেশ্বর শ্বশুরালয়ে বাস করিবার কালীন তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব হয়; বিশেষতঃ দত্তজা মহাশয় কলিকাতা নিবাসী নহেন, তিনি উপায়াক্ষম হইয়া কলিকাতায় সম্প্রতি আসিয়াছেন। কথাবার্ত্তায় ব্রজেশ্বরর গোবর্দ্ধনকে সদ্বংশজাত ও ভদ্র জানিয়া ব্যবসায়ে অংশীদার ভাবে গ্রহণ করিলেন। উভয়েই বিশেষ উৎসাহ সহকারে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। গোবর্দ্ধন কায়িক পরিশ্রমে ব্রজেশ্বরে লভ্যের অর্দ্ধাংশের অধিকারী, এজন্য তিনি কার্য্যারম্ভে বিশেষ তৎপরতা ও উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বর ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, কারবারে লাভ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, প্রথম প্রথম বেশ লাভ হইতে লাগিল। গোবর্দ্ধন পয়সা কড়ি লইয়া বিদেশে আসেন নাই, তাঁহার ও তৎপরিবারবর্গের ভরণপোষণ ভার আপাততঃ ব্রজেশ্বরের স্কন্ধেই ন্যস্ত হইল। ব্রজেশ্বর অংশীদারের কার্য্যে অনুরাগ ও যত্ন দেখিয়া গোবর্দ্ধনের কারণ অর্থব্যয়ে সঙ্কুচিত

হইলেন না। তবে অল্পদিন মাত্র কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, পরিণামে ভাল মন্দ ঘটিতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া আপাততঃ যাহা না হইলে নয়, সেইরূপ বন্দোবস্তে গোবৰ্দ্ধনের ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন।

চটের কারবারের ন্যায় রেড়ীর কলেও শ্রমজীবিদিগকে অগ্রিম টাকা দিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইয়াছে, তাহারা দাদনের টাকা হাতে রাখিয়া প্রভুর নিকট দৈনিক খরচ পত্রের কারণ সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা লইতেছিল। ব্রজেশ্বর পূর্ব্ব কারবারও এই ভাবে চালাইয়া আসিয়াছেন, এজন্য তিনি এরূপ বন্দোবস্তে কোন আপত্তি করিলেন না; কিন্তু তাহাদিগকে এরূপ ভাবে টাকা দিতে লাগিলেন যে, তাহাতে দাদনের কিছু কিছু আদায় আইসে।

দিন দিন রেড়ীর কলের উন্নতি হইতে লাগিল। এদিকে গোবৰ্দ্ধনের এক অরক্ষনীয় কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল, গোবৰ্দ্ধন একমাত্র ব্রজেশ্বরকে সহায় করিয়া দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। ব্রজেশ্বর ভাবিলেন, সময়ে অংশীদারের নিকট টাকা আদায় করিবেন, এখন কন্যাদায় হইতে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য। ফলতঃ গোবৰ্দ্ধনের প্রতি সদয় হইয়া তাহার দুহিতার বিবাহে যাহা কিছু খরচ পত্র হইল, তিনি অম্লান বদনে বহন করিলেন, কোন প্রকার দ্বিরুক্তি করিলেন না। গোবৰ্দ্ধনের সহিত কয়েক মাস আলাপ পরিচয়ে তাহার প্রতি ব্রজেশ্বরের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এজন্য তিনি টাকা দিতে কোন প্রকার আপত্তি করিলেন না। উত্তরোত্তর গোবৰ্দ্ধনের প্রতি ব্রজেশ্বরের বিশ্বাস জন্মিল।

কলের তত্ত্বাবধারণ রক্ষণাবেক্ষণ সমস্ত কার্য্যই গোবৰ্দ্ধনের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, ব্রজেশ্বর দিবাভাগে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া

কাজ কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করেন; সময়ে সময়ে গোবর্দ্ধনকে কল বাটীতে রাত্রি যাপন করিতে হইত। হায়! কালে সকলই হয়, গোবর্দ্ধন ব্রজেশ্বরের বিশ্বাসভাজন হইয়া স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে, এক্ষণে প্রত্যুপকারের প্রতিশোধ স্বরূপ তত্রস্থ নীচ প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের সহায়তায় কল বাড়ীতে চুরির অভিসন্ধি করিল। ব্রজেশ্বর এ সম্বাদ বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলেন না। এক দিবস রজনীযোগে কলবাটীর টাকাকড়ি, মালপত্র সমুদয় চুরি হইয়া গেল, সেদিন রাত্রিতে গোবর্দ্ধন বাটী গিয়াছিল, একারণ গোবর্দ্ধন এই চুরিতে নির্লিপ্ত প্রমাণিত হইল। প্রকৃত পক্ষে সেই চুরিতে তাহার নাম গোপন ছিল, কিন্তু সময়ে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল, চুরির সঙ্গে সঙ্গেই গোবর্দ্ধন পরিবারবর্গসহ স্বদেশ যাত্রা করিল। ব্রজেশ্বর বুঝিলেন, অংশীদারের সংযোগেই এই কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু গোবর্দ্ধনকে সহসা কোন কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না। যাহা হউক তিনি সপ্তাহের মধ্যেই এককালে উক্ত ব্যবসায় তুলিয়া দিলেন, লাভের আশায় কারবার করিয়াছিলেন, ফলে তাহার বিপরীত ঘটিল; তিনি এই কারবারে সর্ব্বসমেত প্রায় তিন সহস্র মুদ্রা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

ব্রজেশ্বর শ্বশুর বাটীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা ও পিতৃ পরিবারবর্গ হরিহরপুর ত্যাগ করিয়া ব্রজেশ্বরের শ্বশুরবাটীর সন্নিকটে একটী বাটী ভাড়া লইয়া একমাত্র তাঁহারই মুখাপেক্ষী হইয়া দিনযাপন করিতে ছিলেন। ব্রজেশ্বর ভাবিলেন, নিজের ও পিতৃ পরিবারবর্গের এরূপ ভাবে ভরণ পোষণ করিতে হইলে তিনি অবিলম্বে নিঃস্ব হইয়া পড়িবেন, উপস্থিত ব্যবসা সূত্রে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতেই ব্রজেশ্বরের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে খরচ পত্রের সুব্যবস্থা

না করিলে তাঁহার আরো অধোগতি হইবে, এই ভাবিয়া তিনি উপায় উদ্ভাবনে উদ্যোগী হইলেন। ব্রজেশ্বরের পিতা বয়সে প্রবীণতা লাভ করিলেও তাঁহার যৌবনোপযোগী শক্তি ও সামর্থ্য ছিল, তিনি নিরুপায় হইয়া পুত্রোপার্জ্জিত অর্থে দিন যাপন করিতেছিলেন; কিন্তু কিরূপে স্বয়ং পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন. তৎপ্রতি তাহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। বৃদ্ধ দেখিলেন, পুত্র যে উপায়ে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছিল, সে পথ এককালে রুদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত না হইলে, তাহার আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। উপার্জ্জনের সময়ে ব্রজেশ্বর পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীর মুখের প্রতি চাহিয়াছেন, এখনও তাঁহার সে ভাবের ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু চিরদিন যে সপরিবারে পুত্রের গলগ্রহ হইয়া থাকিবেন, তাহা ব্রজেশ্বরের পিতার পক্ষে ন্যায় সঙ্গত বোধ হইল না, তাহাতে তিনি ব্রজেশ্বরের লালন পালন ভার একদিনের জন্যও গ্রহণ করেন নাই। পুত্র ধর্ম্মভীরু তাই তাঁহার প্রতি এখনও চাহিয়া দেখিতেছেন, নতুবা তিনি তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে পরস্পরের মনোমালিন্য থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পিতা সঙ্গতিহীন হইলেও ব্রজেশ্বরের বিমাতার নিকট যথেষ্ট অর্থ ছিল, পুত্র মাসিক যাহা দিত, তাহাতে দুঃখে কষ্টে বৃদ্ধের দিনাতিপাত হইতে পারিত; কিন্তু বৃদ্ধের শরীর পরিচর্য্যার অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় থাকায় সে সমস্ত খরচ পত্র বৃদ্ধ বনিতার নিকট হইতে লইয়াই চালাইতেন এবং সময়ে সময়ে কোন কর্ম্ম সূত্রে দশ টাকা উপার্জ্জন করিলে, তাহা প্রায় আপনার নিকটেই রাখিতেন। বৃদ্ধ পুত্রের অবস্থার বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াই সামান্য মূলধন লইয়া একটী দোকান খুলিয়াছিলেন এবং

বিশেষ উদ্যোগ ও পরিশ্রমসহ কারবারটী রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ব্রজেশ্বরের নিকট এ ব্যবসার কথা আদৌ প্রকাশ করেন নাই।

এই ভাবে কয়েক মাস গত হইলে একদিবস কথায় কথায় ব্রজেশ্বর পিতার নিকট আপন অবস্থা প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ পুত্রের সরল ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় পরিচালিত দোকানের কথা উত্থাপন করিলেন এবং একথাও জানাইলেন যে জগ-দীশ্বরের অনুগ্রহে দোকান হইতে যেরূপ আয় হইতেছে, তাহাতে তাঁহার পরিবারবর্গের কথঞ্চিৎ ভরণপোষণও হইতে পারে। ব্রজেশ্বর পিতার কথায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেই মাস হইতে তাঁহার আদেশ মত মাসহারার কথঞ্চিৎ হ্রাস করিলেন। হরিহরপুর হইতে আসিবার সময়ে ব্রজেশ্বর একমাত্র পুত্র ও এক কন্যার পিতা ছিলেন, এক্ষণে তিনি চারি কন্যা ও দুই পুত্রের পিতা হইয়াছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা খরচ পত্র বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু তিনি এখন উপার্জ্জনবিহীন হইয়া-ছেন, তাহাতে সম্প্রতি ব্যবসায়ে কতকগুলি টাকা ক্ষতি হওয়ায় তাঁহার পক্ষে দিন যাপন বিষম কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাহাতে তিনি কৃতিমান ও উদ্যোগী পুরুষ, অকর্ম্মণ্য ভাবে কালযাপনও তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল।

ব্রজেশ্বর এককালে যে অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন, এমত নহে। সম্প্রতি অনেকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া কারবারে তাঁহার তাদৃশ উৎসাহ ছিল না; অথচ ব্যবসা যে উন্নতির সোপান একথা তিনি একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই।

বাল্যকালাবধি ব্রজেশ্বর স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, পরের দাসত্ব স্বীকারে তাঁহার একেবারেই

অনুরাগ ছিল না; কিন্তু সময়ে অর্থাভাবে তিনি এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। তিনি কলিকাতার কোন এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের আফিসে খাজাঞ্চীর কার্য্য গ্রহণ করিলেন। হিসাব পত্রে বিশেষ পারদর্শী হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই ব্রজেশ্বরের পদোন্নতি হইল, তিনি সাহেবের বিশেষ অনুরাগভাজন হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াই প্রভুর বিলাত যাত্রা উপলক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহে প্রয়াসী হইলেন। ব্যবসা সূত্রে টাকা আসিয়াছে, ব্যবসাতেই ব্যয় হইবে, এজন্য তিনি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন বা ভাবিত নহেন। অবশেষে তিনি দেশী বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত ব্রজেশ্বরের আলাপ পরিচয় থাকায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ব্যবসার কথা দশজনের মুখে ব্যক্ত হইল, সকলেই ব্রজেশ্বরের নিকট হইতে বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বর হিসাবী লোক, বৎসরান্তে হিসাব পত্র মিলাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যবসায় দশ টাকা লাভ আছে বটে; কিন্তু দিন দিন যেরূপ দেনা ও লহনা বাড়িতেছে, তাহাতে সময়ে তাঁহার সকল সম্পত্তি পরের হস্তগত হইতে পারে; তিনি বিশেষ সতর্কভাবে খরিদদারদিগের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার টাকা আদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায়, যাহারা প্রথমে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত কারবার বন্ধ করিলেন। যে ভাবে ব্যবসার উন্নতি হইয়া আসিতেছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার অবনতি হইতে লাগিল। ব্রজেশ্বর ভাবিলেন, এ ব্যবসা লাভের হইলেও শুভ নহে; পরিণামে টাকা আদায়

কারণ লোকের সহিত মনান্তর হইতে পারে। তিনি আর মূলধন বাহির না করিয়া ক্রমশঃ ব্যবসা গুটাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাল পত্রের সেরূপ আমদানি নাই বুঝিয়া ব্যাপারীগণ একে একে সকলেই ব্রজেশ্বরকে ত্যাগ করিতে লাগিল। খরিদ্দারের উৎসাহে ব্যবসাদারের উৎসাহ, যখন সে উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছে, তখন ব্যবসা চালাইয়া আর ফল কি? ব্রজেশ্বর পাওনা টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, অথচ মাল পত্র আর খরিদ করিলেন না, ধর্ম্ম-ভীরু লোকে ব্রজেশ্বরের টাকা পরিশোধ করিয়া ঋণ-মুক্ত হইতে লাগিল। আর যাহারা জুয়াচুরি প্রবঞ্চনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহারা ব্রজেশ্বরকে অবসর গ্রহণ করিতে দেখিয়া টাকা পরিশোধে ক্ষান্ত হইল। ব্রজেশ্বর বুঝিলেন যে, তাঁহার সকল টাকা আদায় হইবার নহে, যদিও ব্যবসাতে ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু তিনি যে মূলধন বাহির করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা আর গৃহে আসিল না। তবে তাঁহার ঐ সময়ে সাংসারিক ব্যয় দোকান হইতেই সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি এই ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হওত মূলধন ব্যয় না করিয়া পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। পুনশ্চ অন্য কোন ব্যবসায় নিযুক্ত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি সাধনের বাসনা আর তাঁহার রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মায়াসুন্দরী সংসারের একমাত্র গৃহিণী, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী গৃহস্থালীর সাধ্যমত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; কিন্তু স্বামী বর্ত্তমানে সংসারে যে ভাবে দিন যাপন করিতেন, এক্ষণে তাঁহার আর সে ভাব নাই,। কন্যা, জামাতা প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না, অথচ বৃদ্ধা জানিতেন যে, এক্ষণে তাঁহাকে জামাতার সংসারে কাল কাটাইতে হইতেছে, যদিও পৃথিবীতে তাঁহারা ভিন্ন তাঁহার আর আপনার কেহ নাই, তথাচ পাছে কোন কথা হয়, এই ভয়ে তিনি সতত সতর্ক থাকিতেন, এবং খরচ পত্রের বিষয়ে তিনি কোন কথাই কহিতেন না, তবে আবশ্যক মতে কোন অভাব উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং তাহা পূরণ করিতেন। তিনি একদিনের জন্যও জামাতা বা দুহিতার মনোমালিন্যের কারণ হয়েন নাই। বৃদ্ধার সময়ে সময়ে এরূপ অর্থ সাহায্যেও নিস্তার নাই, তিনি রমাকান্তকে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছেন, রমাকান্ত পিতা মাতা অপেক্ষা

মাতামহীকেই এক মাত্র আপনার বলিয়া জানিত। বালসুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রকারে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তৎসমুদয় বৃদ্ধাকে পূরণ করিতে হইত। ব্রজেশ্বরকে রমাকান্ত কৃতান্ত সদৃশ ভয় করিত, একটী পয়সা মুখ ফুটিয়া তাঁহার নিকট চাহিতে তাহার সাহস হইত না। কোন অপকর্ম্ম করিয়া রমাকান্ত পিতা মাতার নিকটে শাসন ভয়ে অপ্রকাশ রাখিত; কিন্তু স্নেহময়ী মাতামহীর নিকট তাহার কোন কথাই অপ্রকাশ থাকিত না, বৃদ্ধার আদরে রমাকান্ত ভোগবিলাসী হইয়া উঠিল। সুচতুর ব্রজেশ্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রমাকান্ত ধৃত হইল; শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ভয়ে ব্রজেশ্বর সকল সময়ে পুত্রকে শাসন করিতে পারিতেন না। ব্রজেশ্বর সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণতা লাভ করিলেও তাঁহার ক্রোধান্বিত প্রকৃতি, একারণ সময়ে সময়ে রমাকান্ত বিনাপরাধে পিতার নিকট তিরস্কৃত ও শাস্তি পাইত। বৃদ্ধার এরূপ ব্যবহার সহ্য হইত না, তিনি সাতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, সহসা জামাতাকে কোন কথা বলা, তাঁহার প্রকৃতি সঙ্গত নহে, তবে নিতান্ত অন্যায় দেখিলে তিনি ব্রজেশ্বরকে দুই এক কথা না শুনাইয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। যাহা হউক ব্রজেশ্বরের শাসনে এবং তত্ত্বাবধানে দিন দিন বিদ্যোপার্জ্জনে রমাকান্ত উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু মানুষের ক্ষমতায় কোন কার্য্য কদাচ সুসিদ্ধ হয় না, রমাকান্ত পিতার সংশাসনে বিদ্যানুরাগী হইল বটে; কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাহার শরীর রুগ্ন থাকায় মাসের মধ্যে দশ বার দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল। পীড়াক্রান্ত হইয়া রমাকান্ত ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাত বৎসর যথা নিয়মে বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইল। বাটীতে শিক্ষক নিযুক্ত রহিয়াছেন,

প্রতিমাসেই বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হইতেছে; কিন্তু যাহার জন্য এই সকল অর্থব্যয়, সে রোগগ্রস্ত হইয়া এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর রমাকান্তকে সুশিক্ষিত করতঃ জীবনের অবশিষ্টকাল মনের সুখে যাপন করিবেন, মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাহার লেখা পড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। পুত্রের পীড়াধিক্য দেখিয়া তাঁহার সকল আশা ভরসা এককালে নিরাশ সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। তিনি ভাবিলেন যে, রমাকান্ত বাল্যাবস্থাতেই তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইবে। তাহার জন্য এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয় কিছুই ফলপ্রদ হইল না; তথাপি ব্রজেশ্বর পুত্রের চিকিৎসা কারণ অর্থব্যয়ে সঙ্কুচিত হইতেন না, সময়ে সময়ে রমাকান্ত নিরোগ শরীর লাভ করিত; কিন্তু সে ভাব দুই এক মাসের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। ব্রজেশ্বর রমাকান্তকে সুস্থ দেখিলেই পরম উৎসাহে তাহার বিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন; কিন্তু পুনরায় পীড়াগ্রস্ত হইবে, এই আশঙ্কায় তাহাকে যথানিয়মে পরিশ্রম করাইতে তাঁহার সাহস হইত না। যে কোন উপায়ে হউক, রমাকান্তের প্রাণ-রক্ষাই তাঁহার একমাত্র কামনা, তিনি রমাকান্তকেই এক মাত্র জীবনের সার সামগ্রী জানিয়াছেন। যে অর্থ উপার্জ্জনে তাঁহাকে বিস্তর কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, এক্ষণে সেই টাকা জলের মত খরচ হইতেছে, অথচ তিনি আবশ্যকীয় ব্যয়ে কুণ্ঠিত নহেন।

গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতীত পুত্র কন্যার চিকিৎসাদিতে ব্রজেশ্বরের যথেষ্ট ব্যয় হইতে লাগিল। সমাজে তাঁহার বিশেষ মান সম্ভ্রম আছে, দশজনে তাঁহাকে মান্য করে, তিনি উপায় বিহীন হইলেও লোকের কাছে অবস্থার হীনতার পরিচয় দিতেন না, উপায়ক্ষম পুরুষ উপায়হীন অবস্থায় কাল যাপন করিলে

বড়ই কষ্টবোধ করে; ব্রজেশ্বর উদ্যোগী পুরুষ, নিশ্চিন্ত ভাবে দিন যাপন তাঁহার পক্ষে গুরুতর কষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি সাংসারিক কথঞ্চিৎ অভাব পূরণ কারণ একটী বাজারের দারগাগিরী কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তাহাতে বিশেষ লাভ না হইলেও সংসারের দৈনিক বাজার খরচের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। তিনি বাজারের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তথায় মহাজনী কারবার চালাইয়া দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রতিপালিকা মাসীমাতা ঠাকুরাণীর ৺গঙ্গালাভ হয়। হরিহরপুরের বাটী ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে ব্রজেশ্বর দীনবন্ধুকে বিশেষ করিয়া মাসী-মাতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে সংবাদ পাঠাইতে আকি-ঞ্চন করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু চতুর দীনবন্ধু বৃদ্ধার উৎকট পীড়ার সময়ে আদৌ সম্বাদ পাঠান নাই। যখন দেখিলেন বৃদ্ধার সংজ্ঞাহীন হইয়াছে, মুখ হইতে আর একটীও কথা বহির্গত হইতেছে না, সেই অন্তিম সময়ে তিনি ব্রজে-শ্বরকে সম্বাদ পাঠাইয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর সময়ে সময়ে স্বয়ং যাইয়া মাসীমাতাকে দেখিয়া আসিতেন, সম্প্রতি রমাকান্তের পীড়ার কারণ প্রায় দুই মাস কাল আর কোন সম্বাদ লইতে পারেন নাই। যখন হরিহরপুর হইতে পত্র আসিল বৃদ্ধার চরম-কাল উপস্থিত হইয়াছে, পাঠ মাত্রেই তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। যাঁহার একমাত্র স্নেহ যত্নে লালিত পালিত হইয়াছেন, যাঁহার অনুগ্রহে তিনি সাধের সংসার পাতিয়া গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে-ছেন, এতদিনে সেই স্নেহময়ী জননীস্বরূপিণী মাসীমাতা তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবেন। ব্রজেশ্বর বৃদ্ধার সম্বন্ধে এইরূপ যতই ভাবিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর তাঁহার হৃদয় ততই

ব্যথিত হইতে লাগিল; কিন্তু এ সময়ে তিনি বিলম্ব করিলে অন্তিমে হয়ত বৃদ্ধাকে আর দেখিতে পাইবেন না, এজন্য সম্বাদ পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ হরিহরপুরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি পৌছিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধার নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু দীনবন্ধু কায়স্থ কন্যার সদ্গতির কারণ পল্লীস্থ ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে তাঁহার গঙ্গালাভের কোনই বিলি বন্দোবস্ত করেন নাই। বৃদ্ধার যাহা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ছিল দীনবন্ধু সমস্তই ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়াছেন, এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আর দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই বৃদ্ধার পরমায়ু শেষ হইবে, এ সময়ে তাঁহাকে যত্ন দেখাইয়া কোন ফল নাই। ব্রজেশ্বর মাসীমাতা সমীপে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন; পরে এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে গৃহমধ্যে রাখা হইয়াছে, দেখিয়া দীনবন্ধুকে দুই একটী কথা শুনাইলেন। কিন্তু এ সময়ে তাঁহাকে অধিক কথা কহিয়া কিছুই ফল হইবে না, ভাবিয়া তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পল্লীস্থ কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহায্য গ্রহণ অভিপ্রায়ে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্রজেশ্বরের সহিত হরিহরপুরের সমস্ত ভদ্র সন্তানের আলাপ পরিচয় ছিল; কিন্তু তিনি মাসীমাতাকে গঙ্গায় লইয়া যাইবার কারণ যাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, একে একে সকলেই অস্বীকার করিল। ব্রজেশ্বর বুঝিলেন যে, সময় গুণে সকলেই ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে, অবশেষে অর্থব্যয়ে দুইটী মাত্র কায়স্থের সাহায্যে মাসীমাতাকে লইয়া গঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরেই বৃদ্ধার অন্তর্জ্জলির সময় উপস্থিত হইল, পৌষ মাস দারুণ শীতে অপর দুইজন জল হইতে উঠিয়া আসিল, তিনি একাকী গঙ্গা তটে মুমূর্ষা অবস্থাপন্ন মাসীমাতার অন্তর্জ্জলি করিলেন, বৃদ্ধার জীবন

প্রদীপ সঙ্গে সঙ্গেই চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। তিনি উক্ত দুই ব্যক্তিকে সম্ভাষণে প্রীত করিয়া শ্মশানে যথাযথ বৃদ্ধার সৎকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে আর মাসীমাতার বাটীতে গমন করিলেন না, দীনবন্ধু তাঁহাকে সে দিবস তথায় থাকিবার জন্য যথেষ্ট আকিঞ্চন করিল; কিন্তু তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অবিলম্বে ষ্টেশনে আসিয়া যথা সময়ে কলিকাতার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মায়াসুন্দরী ও অন্যান্য পরিবারবর্গ বৃদ্ধার মৃত্যু সংবাদে সাতিশয় বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইল। ব্রজেশ্বরের শ্বশ্রূঠাকুরাণী বেয়ান ঠাকুরাণীর গঙ্গালাভ হইয়াছে শুনিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ যাপিত হইলে, ব্রজেশ্বর অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহাকে বাজারের কাজ চালাইতে হয়, তিনি সাতদিবস অনাহারে যাপন করিয়াছেন, তাহাতে দারুণ শীতে বৃদ্ধার সৎকার করিতে তাঁহার কষ্টের একশেষ হইয়াছে, পরদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যথাকালে প্রভুর কার্য্য সাধনে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সময় কাহারও মুখাপেক্ষি নহে, দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধার শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল, ব্রজেশ্বর মাসীমাতার নিকটে বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে তিনি যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া বৃদ্ধার শ্রাদ্ধ শান্তি নির্ব্বাহ করিলেন।

রমাকান্তের পর ব্রজেশ্বরের যথাক্রমে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের লালন পালন ও লেখা পড়া শিক্ষায় রায় মহাশয়ের কোন প্রকার ঔদাস্য বা অবহেলা নাই, কালক্রমে প্রথম কন্যাটীর বিবাহের কাল উপস্থিত হইল। দুহিতার পরিণয় কার্য্য পিতা ব্যতিরেকে আর কে নির্ব্বাহ করিবে? এজন্য ব্রজেশ্বর

সৎপাত্রের অনুসন্ধান করিয়া যথাকালে আনরপুরের বসুদিগের গৃহে কন্যা সম্প্রদান করিলেন, ইহাতেও তাঁহার প্রায় একসহস্র টাকা ব্যয় হইল। আর দুইটী কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। হরিহর পুর হইতে আসিবার সময় যেরূপ সম্পত্তি লইয়া তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সে টাকা থাকিলে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ জন্য চিন্তিত হই- বার কোন কারণ ছিল না, যাহাহউক গত বিষয়ের অনুশোচনায় কোন ফল নাই, এখন বাজারের যে কাজ চলিতেছে ; তাহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত অর্থ পূরণ হইতেছে না, বাজারে যে চোটার কারবার খুলিয়াছিলেন, তাহাতেও পরিণামে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মুলধন যৎসামান্য মাত্র নষ্ট হইয়াছিল।

রমাকান্ত চিররুগ্ন হইয়াও মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরী- ক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে বৃত্তি ঘটিল না। রায় মহাশয় পুত্রকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া নিজে যথাসাধ্য পুত্রের জন্য পরিশ্রম করিতে লাগি- লেন, ব্রজেশ্বরের শ্রম ব্যর্থ হইল না, সে বৎসর রমাকান্ত প্রথম পারিতোষিক লাভ করিল। এই সময়ে তাঁহার মধ্যম পুত্রের জন্ম হয়, প্রথম পুত্র পারিতোষিক লাভ করিয়াছে, আবার যথাক্রমে তিনটী কন্যা সন্তানের পর নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ব্রজেশ্বরের আনন্দের সীমা নাই। রায় মহাশয় ভাবিলেন, দুর্দিন ঘুচিয়া সুদিনের বিকাশ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঠিক সেই সময়ে তিনি জনৈক ব্যক্তির কথায় একটী ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলেন, স্বল্প দিনের মধ্যেই উক্ত ব্যবসা তাঁহার পক্ষে বিশেষ লাভ জনক বিবেচিত হইল, তিনি কলিকাতায় আসিয়া যে যে কার্য্যে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে ক্ষতি ব্যতিরেকে লাভ দেখিতে পান নাই; কিন্তু এবার প্রকৃত পক্ষে চারি পাঁচ মাসের মধ্যেই এক সহস্র টাকা উপায় করিলেন। কিন্তু উক্ত কার্য্য সম্বৎসরের জন্য নহে, বৎসরের মধ্যে কিছুদিন চলিত, অবশিষ্ট কাল নিষ্কর্ম্মা ভাবে কাল কাটিয়া যাইত। রায় মহাশয় উক্ত ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া বাজারের কার্য্যে এককালে জবাব দিয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন, কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, আগামী বৎসরে তিনি পুনরায় এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবেন। যথাসময়ে মধ্যম কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে ব্রজেশ্বর যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রায় সাত শত টাকা ব্যয় হইল, সম্প্রতি ব্যবসা সূত্রে যে টাকা আসিয়াছিল, তাহা হইতেই এই ব্যয় নির্ব্বাহ হইল, এজন্য তিনি ব্যথিত হইলেন না।

মায়াসুন্দরীর মাতাঠাকুরাণী দিন দিন বয়স্থা হইয়া পড়িয়াছেন, দুহিতার সংসার লইয়াই তিনি সংসারী হইয়াছেন, সারাদিন পরিশ্রম করিয়া দৌহিত্র দৌহিত্রীবর্গের লালন পালন, কন্যা জামতার যাহাতে সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন হয়, বৃদ্ধা নিয়ত তৎপ্রতিই দৃষ্টি রাখিতেন। মায়াসুন্দরী ব্রজেশ্বরের গৃহিনী হইলেও মাতার একমাত্র কন্যা বলিয়া সংসারের যাবতীয় গুরুতর কার্য্য ভার একমাত্র মাতার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিতেন।

রমাকান্তের একটী পয়সার দরকার হইলে ব্রজেশ্বরকে জানাইতে সাহস হয় না, একমাত্র স্নেহময়ী মাতামহী ঠাকুরাণী রমাকান্তের সহায় ও আবদারের ঠাঁই; রমাকান্ত বৃদ্ধার নয়নমণি। দৌহিত্রের মনোরঞ্জনে তাঁহার অসন্তোষ বা দ্বিরুক্তি নাই, যে কোন কারণে রমাকান্ত

তাঁহার নিকট অর্থ যাচঞা করিলেই বৃদ্ধা তাহা তদ্দণ্ডে প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত যে দুইটী দৌহিত্রীর বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগের স্বামী আসিলেও তাঁহার সময়ে সময়ে খরচ পত্র হইয়া থাকে। স্বামী পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া, বাটী ক্রয় করায় বৃদ্ধার নগদ সম্পত্তি প্রায় শেষ হইয়াছিল। মিত্রজা মহাশয় তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না, অধিকন্তু দেশত্যাগ কালে ভদ্রাসনখানি গুরুদেবকে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। একারণ বৃদ্ধা যৎসামান্য টাকা লইয়াই রমাকান্ত এবং অন্যান্য পরিবারবর্গের সাধ্যমত অভাব মোচন করিতেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার বার, ব্রত, তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি সৎকার্য্যেও যথেষ্ট ব্যয় ছিল। মনে ভাবিয়াছিলেন, সংসারে দুহিতা ব্যতীত তাঁহার উত্তরাধিকারী আর কেহই নাই, তাঁহার অবর্ত্তমানে মায়াসুন্দরী, ব্রজেশ্বর, রমাকান্ত প্রভৃতি কন্যাসংক্রান্ত পরিবারবর্গ বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিবে। জামাতা না থাকিলে একাকিনী কলিকাতায় থাকিতে হইত, স্থানান্তরে যাইলে তাঁহার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইত, অধিকন্তু যাহাদের মায়াজালে জড়িত হইয়া তিনি সংসারে আছেন, সেই মায়াসুন্দরী, ব্রজেশ্বর প্রভৃতি সকলকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন, এই জন্যই তিনি পতিবিয়োগে জামাতা এবং কন্যাকে তাঁহার বাটীতে থাকিবার জন্য আকিঞ্চন ও অনুরোধও করিয়াছিলেন।

রমাকান্ত দেখিতে দেখিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, এই সময়ে তাহার কৃষ্ণলালবাবুর প্রথমা কন্যা সাধনার সহিত শুভ-বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়, ব্রজেশ্বর পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া প্রসন্ন মনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন, বাল্যকাল হইতে উপার্জ্জনের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর বিষয় কর্ম্মে তাদৃশ স্পৃহা নাই।

রমাকান্ত মাতামহীর সোহাগের সামগ্রী, তাই রমাকান্তের সহধর্ম্মিণী ও বৃদ্ধার অঞ্চলের নিধি, বৃদ্ধা সাধনার বেশ বিন্যাস ও আহার পরিচর্য্যায় বিশেষ ব্যস্ত থাকেন, সাধনাকে পাইয়া তিনি যেন স্বর্গ হাতে পাইয়াছেন। সাধনা পতিগৃহে যাহাতে সুখে থাকে, কোন প্রকার কষ্ট না হয়, এই চিন্তাতেই মাতামহীর অষ্টপ্রহর কাটিয়া যায়। কিন্তু দিদি শাশুড়ীর এত স্নেহ, এত যত্ন অভাগিনী সাধনাকে বহুদিন ভোগ করিতে হইল না, বিবাহের পর তিনি সপ্তাহকাল বৃদ্ধার আদর যত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার অন্তিম সময়ে সাধনা পুনরায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন, স্নেহের কি বিচিত্র গতি! তিনি রুগ্ন শয্যায় পতিতা থাকিয়াই দৌহিত্র-বধূর পরিচর্য্যা করাইতেন। হায়! এ হেন সাধের রমাকান্তের মাতামহী পরিবারবর্গকে নয়নজলে ভাসাইয়া অনন্তধামে গমন করিলেন। হাহাকারের বিষাদরোলে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল, ব্রজেশ্বর এতদিনে মাতৃস্বরূপিনী শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে জন্মের মত বিদায় দিয়া বিষণ্ণ হইলেন। সংসার বন্ধন শিথিল হইল
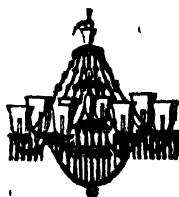
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণলাল বসু পরিমিত ব্যয়ী, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি চিরকাল জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিয়া কালযাপন করিয়াছেন, একারণ তাঁহার প্রাপ্য বিষয়ে তিনি কথঞ্চিৎ বৈমুখ হইয়াছিলেন, নাবালক অবস্থায় কৃষ্ণলালের পিতৃবিয়োগ হয়, একমাত্র জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্যামলাল তাঁহাকে লালন পালন ও লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। প্রাপ্ত বিষয়ে জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলেও তাঁহার ভ্রাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার কোন অংশে ন্যূনতা হয় নাই। সময়ে উপার্জ্জনক্ষম হইয়াও তিনি জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া দিন যাপন করিতেন। ইতিপূর্ব্বেই কৃষ্ণলালবাবুর বিবাহ হইয়াছিল; শ্যামলালবাবু কনিষ্ঠের প্রতি যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেও দিনে দিনে স্ত্রীর কথায় ও প্ররোচনায় তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ হ্রাস হইয়া আসিল। কৃষ্ণলাল কোন অপরাধে অপরাধী না হইলেও জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বভাবের বৈলক্ষণ্য দেখিতে লাগিলেন, তিনি নিজে যেমন সরল প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তদ্রূপ সরলা ও সাধ্বীসতী, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনে একদিনের জন্যও তাঁহার ভাবান্তর হয় নাই।

কৃষ্ণলালের আয় তাদৃশ অধিক না হইলেও পৈতৃক সম্পত্তির ও স্বীয় আয়ে সংসারযাত্রা একরূপ নির্ব্বাহ হইয়া যায়, কৃষ্ণলাল সরলার সরল প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছেন, স্বামী স্ত্রীতে মনের সুখে পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিতেন, তাঁহার বিবাহের পর হইতে শ্যামলালের সে ভাবের যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তিনি উপার্জ্জনক্ষম অবস্থায় ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া সমীপে যেরূপ স্নেহ ভাজন ছিলেন, এক্ষণে আর সে ভাব দেখিতে পান না। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের মুখে আদৌ দ্বিরুক্তি নাই, শ্যামলাল বা তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের প্রতি অকারণ কটূক্তি প্রয়োগ করিলেও তাঁহারা কোন কথাই কহিতেন না। শ্যামলালের স্ত্রীর ইচ্ছা যে কৃষ্ণলাল এক্ষণে উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছেন, দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, বঙ্গগৃহে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দাঁড়াইয়াছে কেন তাঁহার স্বামী আর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে একান্ন প্রতিপালন করিবেন। শ্যামলালের অবস্থা কৃষ্ণলালের অপেক্ষা অনেক ভাল, জ্যেষ্ঠ সঙ্গতিপন্ন পুরুষ, কনিষ্ঠের যৎসামান্য আয, একত্র থাকায় হয়ত সময়ে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে, এই যুক্তি ধরিয়া তিনি স্বামীকে পুনঃ পুনঃ তাঁহার অভিপ্রায় মত ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্যামলালের স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করিবার শক্তি ছিল না, বিন্দু বিন্দু বারি পাতে যেমন সুদৃঢ় প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যায়, পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় সেইরূপ শ্যামলালেরও মতি গতি ফিরিল।

উন্নতির পথ রোধ হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অবনতির সূত্রপাত হয়। শ্যামলাল স্ত্রীবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া স্নেহাস্পদ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। তৎসহ পৈতৃক

বিষয়াদির বণ্টনও হইয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ স্ত্রীর পরামর্শমত যাহা করিয়াছেন, কনিষ্ঠ অবনত মস্তকে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, ভ্রাতার কথায় কোন আপত্তি করেন নাই। জ্যেষ্ঠ অভিভাবক ভাবে কৃষ্ণলালের তত্ত্বাবধারণ করিতে ছিলেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, জ্যেষ্ঠের জীবনকাল তাঁহারই শরণাগত থাকিয়া দিনাতিপাত করিবেন; কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতি বাম হইয়াছেন, সাধে বাদ সাধিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাকে পৈতৃক ভদ্রাসনের নির্দ্দিষ্ট অংশে পৃথক সংসার পাতিতে হইয়াছে। তিনি এতাবৎকাল জ্যেষ্ঠের মুখের প্রতি তাকাইয়া বিষয় কর্ম্ম কিছুরই প্রতি লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু এক্ষণে সংসার ধর্ম্মের সকল ভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে। দুর্ব্বলের বল হরি, কৃষ্ণলাল একমাত্র শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করিয়া সংসারসমুদ্রে ঝাপ দিয়াছেন।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সরল প্রকৃতি; খল কপটতার লেশমাত্র কাহারও হৃদয়ে নাই, একারণ কৃষ্ণলাল পত্নীসহ সুখসচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। পৃথক হইবার পূর্ব্বেই শ্যামলালের ঘনরাম ও কৃষ্ণলালের সুধারাম নামক পুত্র জন্মিয়াছিল। ভ্রাতাদ্বয়ে বিশেষ সদ্ভাব ছিল, ঘনরাম সুধারামের জ্যেষ্ঠ; কৃষ্ণলাল পৃথকান্ন হইয়াও জ্যেষ্ঠের পরিবারবর্গকে সমভাবে দৃষ্টি করিতেন; কিন্তু তাহাও শ্যামলালের পত্নীর অসহ্য হইত।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনরামকে সদাসর্ব্বদাই বহুমূল্য বেশভূষায় সুসজ্জিত রাখেন, সুধারাম অল্পবয়স্ক বালক হইলেও পিতৃদত্ত পোষাকেই তুষ্ট থাকে, বালক মাতা পিতার মত উদার প্রকৃতি; যাহা না হইলে নয়, তাহা পাইলেই

সুধারাম আর কোন অভাব বোধ করে না। ঘনরাম ও সুধারাম উভয়েই এক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কনিষ্ঠের অধ্যয়নে বিশেষ যত্ন ও অনুরাগ, একারণ সুধারাম স্বল্পদিনেই উন্নতিলাভ করিল, উভয়ে বয়সের তারতম্যে ও পাঠ্যপুস্তকের বিভেদ সত্ত্বেও স্বল্পদিনের মধ্যেই সুধারাম ঘনরাম অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিতে লাগিল। সুধারামের বিদ্যানুরাগ ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, তাহার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী ঈর্ষানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন; কিন্তু বালকের লেখাপড়ায় তাঁহার স্ত্রীবুদ্ধি নিষ্ফল হইল।

কৃষ্ণলাল মাসিক আয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একমাত্র সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় সুখসচ্ছন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন, সুধারাম লেখাপড়ায় দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছে, পিতা মাতার আনন্দের সীমা নাই। সুধারাম পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ কালে সাধনার জন্ম হয়, সাধনা অলৌকিক রূপ লাবণ্য, দর্শক মাত্রেই তাহাকে দেখিবা মাত্র বিমুগ্ধ হইত, পিতা মাতাও ভ্রাতার স্বভাব চরিত্র লোকের আদর্শ ছিল, বালিকা অল্প বয়স হইতেই আত্মীয়বর্গের যাবতীয় সদ্‌গুণের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। আজকাল হিন্দুসমাজে দিন দিন বালিকা শিক্ষার প্রাধান্য বাড়িতেছে, কিন্তু কৃষ্ণলালের গৃহে এ পাশ্চাত্য সভ্যতার আদৌ সূত্রপাত হয় নাই, সাধনা পুস্তক পাঠে বঞ্চিতা হইয়া দিনে দিনে বালিকা বয়সেই গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্যে দক্ষা হইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে সরলা সাধনাকে পাইয়া সুখী হইয়াছিলেন, কারণ সংসারের কাজ কর্ম্মে সাধনা সদা সর্ব্বদাই মাতার সাহায্য করিত। ঘরে ঘরে ভ্রাতা ভগিনীতে বিবাদ কলহ হইয়া থাকে, কিন্তু সুধারাম ও সাধনায় এরূপ সদ্ভাব ছিল যে, বালক বালিকার একজন

কিঞ্চিৎ মাত্র আহার সামগ্রী পাইলে অন্যকে না দিয়া মুখে তুলিত না। সাধনার যে মাসে জন্ম হয়, সেই মাস হইতেই কৃষ্ণলালের মাসিক পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, কৃষ্ণলাল এ কারণ পুত্র কন্যাকে সমভাবেই দেখিতেন, তাহাতে সর্ব্বগুণ সম্পন্না সাধনা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার অবাধ্য নহেন। বালিকার বেশ বিন্যাস বা অন্য কোন ভোগ বিলাসে স্পৃহা ছিল না, অন্যান্য বালক বালিকাদিগের সহিত বেশ সদ্ভাব, ক্রীড়ার সময় দেখিতে না পাইলে অভাব বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য বালক বালিকা যেরূপ ভাবে কাটাইত, সাধনা তাহাদিগের সমজুটি হইয়াও সেরূপ না করিয়া মাতার আজ্ঞানুসারে চলিত।

সুধারাম লেখা পড়া করিত, সাধনা ভ্রাতার কাগজ কলম পুস্তক প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিত। কৃষ্ণলাল কার্য্য স্থান হইতে গৃহে আসিলে সাধনা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। একজন মাত্র পরিচারিকা, যথা সময়ে তাহার সকল কর্ম্ম হইয়া উঠে না, কুমারী সময়ে সময়ে তাহারও সাহায্য করিয়া থাকে। সাধনার যেমন রূপ তেমনই গুণ, পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, সহোদরের প্রতি মান্য প্রদর্শন, এ সকল বিষয়েও বালিকার দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালীর গৃহে কন্যা অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেই, অভিভাবকগণ বিবাহ জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে, যদিও কাল মাহাত্ম্যে সেভাবের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও দিন দিন ঘটিতেছে, তথাপি কৃষ্ণলাল উনবিংশ শতাব্দীর পিতা হইয়াও কন্যা নবমবর্ষে পদার্পণ করিবা মাত্র বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাধনা নবমবর্ষিয়া হইলেও তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এরূপ সুগোল গঠন যে, একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার ন্যায় তাহাকে দেখাইত।

কৃষ্ণলাল কন্যার সম্বন্ধ কারণ ঘটক সাহায্যে মনোনীত পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কালস্রোতে ক্রমান্বয়ে একটীর পর একটী করিয়া কৃষ্ণলাল সর্ব্বসমেত তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যার পিতা হইলেন, জ্যেষ্ঠ কন্যা সাধনার বিবাহ সময় উপস্থিত হইয়াছে, কন্যাদায় অপেক্ষা হিন্দুগৃহে বিষম দায় বোধ হয় আর নাই, তাহাতে সাধনা তাঁহার লক্ষ্মী মেয়ে, বালিকার জন্মগ্রহণ হইতেই কৃষ্ণলালের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা মনোমত বরে সাধনাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

সুধারাম দ্বাদশবর্ষীয় বালক হইলেও এক্ষণে ইংরাজী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করিতেছেন, আর ঘনরাম ভ্রাতাপেক্ষা তিন চারি বৎসরের জ্যেষ্ঠ হইলেও লেখা পড়ার তাদৃশ মনোযোগ না থাকায় এখনও ষষ্ঠ শ্রেণীতে রহিয়াছে। কৃষ্ণলাল সময় পাইলে সুধারামের লেখা পড়ার তত্ত্বগ্রহণ করেন, প্রতিদিন নিয়মিত পড়ান তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। শ্যামলাল তাঁহার অপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন, তিনি ঘন-রামকে পড়াইবার জন্য বাটীতে শিক্ষক নিযুক্ত রাখিয়াছেন। কৃষ্ণলাল শ্যামলালের সহিত পৃথক হইলেও এখন শ্যামলাল সুধারামের গুণে মুগ্ধ, সহধর্ম্মিণীর কথায় জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে পৃথক করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার যে কোন অপরাধ নাই, শ্যামলাল পরে তাহা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এজন্য স্ত্রী সামান্য কোন ত্রুটি লইয়া দেবরের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিলে তিনি তৎপ্রতিকারে এখন আর মনোযোগী হন না। যদিও বহুদিন হইল উভয়ে পৃথক হইয়াছেন, তথাপি কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের মান্যদানে কোন অংশে ত্রুটি করিত না। ঘন-রামও সুধারামকে সহোদরের মত ভালবাসিত, সুধারাম

জ্যেষ্ঠের পড়ার জন্য শিক্ষক মহাশয় বাটীতে আসিলেই তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া কঠিন ও দুঃসাধ্য পাঠ গুলি বুঝিয়া লইত। শিক্ষক মহাশয় সুধারামের বিদ্যানুরাগ দর্শনে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন, ঘনরাম এই অবকাশে কাগজ বা শ্লেট লইয়া ছবি আঁকিত বা নাটক নভেল পড়িত। গৃহিণীর ইচ্ছা পুত্রের শিক্ষকের নিকটে সুধারামের পড়া বন্ধ করেন, কিন্তু পতির ভাবগতিক দেখিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইত না। সময়ে সময়ে ঘনরামকে মনের কথা খুলিয়া বলিতেন, কিন্তু পুত্র মাতার কথায় আদৌ কর্ণপাতও করিত না, পুনঃ পুনঃ জননী এরূপ বলিলে হয়ত একদিন তাঁহাকে অকথ্য কথায় ভর্ৎসনা করিত, জননী বুঝিতে পারিল যে, সন্তান হইতে তাহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবার নহে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নশ্বর সংসারে যাহা যায়, তাহা আর হয় না। রমাকান্তের একমাত্র আব্দারের দিদিমা, ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে রমাকান্ত সংসার অরণ্যময় দেখিতেছে; রমাকান্তের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী সকলেই বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু মাতামহী তাঁহাকে যে ভাবে দৃষ্টি করিতেন, সে দৃষ্টি আর কোথায় পাইবেন? ব্রজেশ্বরকে রমাকান্ত বাল্যকাল হইতেই ভয় করিত। তাহাতে ব্রজেশ্বরের এরূপ প্রকৃতি নহে যে, তিনি পুত্রের অভাব বুঝিয়া কোন প্রকার খরচ পত্র দেন। বাল্যকাল হইতেই রমাকান্ত বিলাসের দাস, বেশ ভূষা অঙ্গ সৌষ্টবের প্রতি যদিও তাহার তাদৃশ লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু সে সাতিশয় আমোদপ্রিয় ছিল, বন্ধুবান্ধবের সহিত আহার বিহার অভিনয় দর্শন প্রভৃতিতে তাহার একান্ত অনুরাগ; কিন্তু পয়সা না থাকিলে, এ সকল বাসনা পূর্ণ হয় না। এখন তাহার কে আর সে অভাব পূর্ণ করিবে? সে মনে মনে সতত অসুখী, আমোদ আহ্লাদ রমাকান্তের সমস্তই একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে।

একক্ষণে ব্রজেশ্বর রমাকান্তের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, রমাকান্ত সুন্দর শিশুর পিতা হইয়াছে,ব্রজেশ্বর পৌত্রকে ক্রোড়ে করিয়া সংসার সাধ মিটাইতেছেন,বধূমাতা সাধনা আসিয়া অবধি তাঁহার সংসার উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি পৌত্রের জন্মগ্রহণের পর হইতেই সময়ে সময়ে দুই দশ টাকা অতিরিক্ত উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, সুখসচ্ছন্দে মনের আহ্লাদে ব্রজেশ্বরের দিন কাটিতে লাগিল। যথা সময়ে বিস্তর ব্যয়ে মহোৎসবে পৌত্রের অন্নপ্রাশন দিলেন, "মহেন্দ্র" নাম ব্রজেশ্বরের চিরবাঞ্ছিত, একক্ষণে তিনি পৌত্রের নাম মহেন্দ্র রাখিলেন। মহেন্দ্রনাথ দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পৌত্রের জন্মগ্রহণে তিনি বহুদিনের পর উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। মহেন্দ্র সকলেরই নয়নরঞ্জন ও আদরের সামগ্রী, যে তাহাকে একবার দেখিয়াছে, সে তাহারই হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছে।

আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, সাধনার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু যুবতীর সলজ্জভাব আজিও সমভাবেই আছে, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদিনী দেবর প্রভৃতি যাহার সহিত যেরূপ ভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সাধ্বীসতী হিন্দুললনা সে সমস্ত ভাবভক্তিই বজায় রাখিয়াছে, সাধনার সুখ্যাতি পল্লীস্থ স্ত্রী-পুরুষ সকলের মুখেই ব্যক্ত হয়; কিন্তু রমণীর সে সুখ্যাতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, সে শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর আদর্শপথ অবলম্বন করিয়া শ্বশুরালয়ে দিন যাপন করিয়া থাকে। সাধনার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী সাতিশয় সরল প্রকৃতিবিশিষ্টা, তিনি স্বয়ং গৃহিণী হইলেও সংসারের ভালমন্দ সকল দিক বিশেষ করিয়া দেখিতে পারেন না, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা বধূমাতা সংসারের সমস্ত ভারগ্রহণ করে, সুচতুরা হয়; কিন্তু সাধনার

প্রকৃতি দেখিয়া তিনি স্থির বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূমাতার দ্বারা তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। আহার বিহার বেশ-ভূষা কোন বিষয়েই সাধনার স্পৃহা নাই, বালিকা বয়স হইতেই ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট দিন কয়েকটী কাটাইতে পারিলেই সাধনা যেন আপনাকে কৃতার্থ ও ভাগ্যবতী জ্ঞান করে। ধর্ম্মপরায়ণা সাধনা মিথ্যা প্রবঞ্চনার চিরবিদ্বেষী, ঘটনাক্রমে কোন কার্য্যে কোন প্রকার অনিষ্ট করিলে, অন্যের প্রতি দোষা-রোপ বা প্রবঞ্চনা বাক্য আদৌ তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত না, সে নিজমুখে শ্বাশুড়ী ও ননদিনী সমীপে আপন ত্রুটী প্রকাশ করিত, ও সময়ে সময়ে তজ্জন্য তিরস্কৃতা ও ভর্ৎসিতাও হইত। সাধনা স্বার্থের জন্যও কদাচ সত্যের অপলাপ করে নাই। সাধনা জানিত, সতীর পতিই পরম গুরু, পতিনিন্দায় অধোগতি হয়, সে সেই স্বামীর মুখের প্রতি তাকাইয়াও তাহার অপকর্ম্মের জন্য দোষ উল্লেখে কুণ্ঠিত হইত না। বাদবিসম্বাদ-পূর্ণ সংসারে কলহ বিবাদ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, সকলের প্রকৃতি সমান নহে; ব্রজে-শ্বর যে ধাতুতে গঠিত, রমাকান্তের প্রকৃতি সেরূপ নহে। ব্রজেশ্বরের আয়ের প্রতি দৃষ্টি আছে, রমাকান্ত ব্যয়ে মুক্তহস্ত, পিতা পুত্রে এইরূপে অনেক বিষয়ে অনেক সময়ে মতান্তর উপস্থিত হইয়া বিবাদ বাধিত। ব্রজেশ্বর ও রমাকান্ত উভয়েরই উগ্রস্বভাব, ক্রোধে অন্ধ হইয়া পরস্পর নানা-প্রকার বিবাদ করিতেন। স্বামী পরমগুরু হইলেও সাধনা সাক্ষাৎ পাইলে স্বামীকে কত কথাই বলিতেন, কত বুঝাইতেন, অথচ এরূপভাবে বাক্যগুলি প্রয়োগ করিতেন, যাহাতে স্বামী মনে কোন ব্যথা না পান। রমাকান্তের প্রকৃতি ভিন্নভাবাপন্ন হওয়ায় দুই তিন মাস অন্তর পিতা পুত্রে

মনান্তর উপস্থিত হইত। সাধনার নিষেধ বাক্য তাহার স্মরণ থাকিত না, পুনঃ পুনঃ এইরূপ আচরণে সে গুরুজনবর্গের অপ্রীতিভাজন হইত।

ব্রজেশ্বর বয়ঃক্রম পঞ্চচত্বারিংশ অতীত হইলেও আবার একটী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন, এ ব্যবসায়ে তাঁহার মধ্যে মধ্যে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত স্নানাগার বন্ধ থাকিত। এরূপ বয়সে এ প্রকার গুরুতর পরিশ্রম তাঁহার পক্ষে অসহ্য; কিন্তু তিনি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কোন অংশে ক্রটী করেন নাই, দুর্ভাগ্যবশতঃ বাজার এরূপ দাঁড়াইল যে, সে কার্য্যে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি এককালে পাঁচশত টাকার অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। একে অর্থনাশজনিত মনস্তাপ, তাহাতে এরূপ দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার শরীর এককালে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি এই ব্যবসা হইতে নিবৃত্ত হইবার পরই উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইলেন, পীড়ার বিষম যন্ত্রণায় তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। সুযোগ্য চিকিৎসক তাঁহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন, দুই সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হইল; কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না, তিনি পীড়ার নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

দুঃসময়ের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হইতে বিপদরাশি সমুপস্থিত হইয়া থাকে, ব্রজেশ্বরের পিতা ইতিপূর্ব্বে যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, দিন দিন সেই কার্য্যে উন্নতি হওয়ায় তাঁহার বা পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন অভাব ছিল না, পুত্রের নিকট মাসিক যে সাহায্য পাইতেন, তাহা প্রায় তাঁহার সঞ্চিত হইত। যে দিন যাহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, যথাশক্তি চেষ্টা করিলেও তাহার কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। ব্রজেশ্বরের

পিতা শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন রাখিলেও বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গেই শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এতদিন বৃদ্ধ ভাঙ্গা ঘরে চাড়া দিয়া কাটাইতে ছিলেন, এখন তাঁহার পরমায়ুর শেষ হইয়া আসিয়াছে, শিরোদেশে শমন প্রহরী দাঁড়াইয়া ভ্রুকুটি করতঃ সময়ের প্রতিক্ষা করিতেছে। বৃদ্ধ উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, বিশেষ সতর্ক ও সাবধান থাকিয়া আহারাদি করিলেও দিন দিন রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল; চিকিৎসায়ও কোন ফল দর্শিল না। বৃদ্ধ বুঝিলেন, এবার আর রক্ষা নাই, জন্মগ্রহণ করিলেই মরিতে হয়, নিশ্চিত রহিয়াছে, কিন্তু সাধের সংসারে তিনি বহুকাল ঘরকন্না করিতেছেন, একে একে দুইটী স্ত্রী গত, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর এখনও যৌবন। এ পক্ষের স্ত্রীর সন্তান সন্ততি যদিও কিছু হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সহোদরা একটী পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাহার কোন আত্মীয় স্বজন না থাকায় বালকটী মাসীমাতার গলগ্রহ হইয়াছে, অগত্যা বৃদ্ধ স্ত্রীর মনোরঞ্জন উদ্দেশে শালিপতিভায়ের পুত্রটীকে আপনার ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বালকটীতেই তাঁহার স্নেহ মমতা সমস্ত স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করায় তাঁহার এক পুত্র জন্মে, প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজেশ্বর ও আর একটী কন্যা ছিল, বৃদ্ধ কন্যাটীর বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহার সদা সর্ব্বদা তত্বগ্রহণে বৃদ্ধের তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। কন্যাটী সৎপাত্রে পড়িয়াছিল, ব্রজেশ্বরের ভগিনী পিতার ব্যবহারে মনক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বামী-গৃহে থাকিয়া যুবতী অবস্থায় সহোদর বা পিতার তত্বগ্রহণে তাদৃশ সক্ষমা হইতেন না, লোক পরম্পরায় সময়ে সময়ে তাঁহাদের সম্বাদ লইতেন মাত্র।

ব্রজেশ্বর সক্ষম অবস্থায় ভগ্নীর সংবাদ লইতে কোন অংশে ক্রটি করেন নাই, তাঁহার পিতা পৈতৃক বিস্তর বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইলেও জুয়া খেলায় এরূপ অবস্থাহীন হইয়াছিলেন। বৈমাত্র ভ্রাতার লেখা পড়ার জন্যও ব্রজেশ্বর সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটি করেন নাই,তবে তাঁহাদিগকে মাসীমাতার গৃহে স্থান দিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। ব্রজেশ্বরের ভ্রাতার নাম তারকেশ্বর, সে দ্বাদশবর্ষ মাতৃহারা হইয়াছে, লেখা পড়ায় তাহার অনুরাগ থাকিলে ভ্রাতৃ সাহায্যে অবশ্য সে একজন মানুষ হইয়া উঠিত, কিন্তু তাহার প্রতি পিতার তাদৃশ শাসন না থাকায়, সে ক্রমে ক্রমে অধঃপাতে গিয়াছিল।

পিতৃগত প্রাণ ব্রজেশ্বর রুগ্নশয্যায় পড়িয়া আছেন, এদিকে তাঁহার জন্মদাতাও উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া দায়। সক্ষম অবস্থায় স্বয়ং যাইয়া পিতৃদেবের চরণ দর্শন করিয়া আসিতেন, এক্ষণে নিজে উত্থানশক্তি রহিত, এ সময়ে পিতৃদেবকে নয়নের অন্তরালে রাখিতেও তাঁহার ইচ্ছা হয় না। এরূপ শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে দূরে রাখিয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই বৈমাত্র ভ্রাতা তারকেশ্বর তাঁহার গলগ্রহ হইয়াছে, কাজ কর্ম্ম নাই, কেবল অসৎসংসর্গে দিবারাত্রি যাপন করে, ব্রজেশ্বর ভ্রাতার অবৈধ ব্যবহার জন্য তাঁহার মুখ দর্শন করিতেন না, তবে ক্ষুধায় অন্ন দিতে তিনি কখনও কাতর হন নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কনিষ্ঠের নিকটে পিতৃদেবকে এ বাটীতে আনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আরও বলিলেন, যতদিন না বাবা সুস্থ ও সবল হইতেছেন, অবশ্য এখানেই থাকিবেন; কিন্তু ভাই তোমায় বিস্তর বুঝাইয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি রুগ্ন, এজন্য পিতার

সেবা শুশ্রূষা তুমি না করিলে কে করিবে? আর বিমাতা-ঠাকুরাণীকেও এখানে লইয়া আইস, আমাদের কার্য্য আমরা করি, তারপর ভগবানের হাত, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তারকেশ্বর বিপথগামী হইলেও জ্যেষ্ঠকে যমসদৃশ ভয় করিত। ব্রজেশ্বর নাবালক অবস্থায় কনিষ্ঠের সংবাদ লইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বৈমাত্র ভ্রাতার কথা স্মরণ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহার লেখাপড়া হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, অভাগা তারকেশ্বর পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইলেও ভ্রাতৃ অনুরাগে অনায়াসেই মানুষ হইতে পারিত; কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ হইলে হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল, একারণ সে জ্যেষ্ঠের মান্যদানে কদাচ বিমুখ হইত না। ব্রজেশ্বর যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই তারকেশ্বর শিরোধার্য্য করিয়া জ্যেষ্ঠের কথায় সম্মত হইয়া, পিতাকে আনয়নার্থ গমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাধনা কৃষ্ণলালের সোহাগের সামগ্রী, আদরের ধন, কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্যস্ত হইয়া কোথাও আর বর পছন্দ হয় না, তাঁহার ইচ্ছা জামতাটীর স্বভাব চরিত্র ভাল হয়, কিঞ্চিৎ সংস্থান থাকে, লেখাপড়া জানে এবং কলিকাতাবাসী হয়। বহু অনুসন্ধানের পর শেষে ব্রজেশ্বরের পুত্র রমাকান্তের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। যদিও ব্রজেশ্বরের সহিত কৃষ্ণলালের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল না, কিন্তু পরস্পর দেখা সাক্ষাতে উভয়েই যে সম্ভ্রান্ত বংশজাত এবং মধ্যবিত্ত অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন, তাহা পরস্পরে জ্ঞাত হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে শুভবিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলে, কৃষ্ণলাল সাধনাকে প্রায়ই নয়নের অন্তরাল করিতেন না, বহুদিন পরে কন্যা বড় হইলে তিনি অগত্যা তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন।

বিবাহ কার্য্যে ভ্রাতা কোন প্রকার সাহায্য না করিলেও তিনি জ্যেষ্ঠের মান্য দানে কোন অংশে ত্রুটি করেন নাই। সাধনা যে ভাবে সুশিক্ষিতা ও সদুপদিষ্টা হই-

য়াছে, তাহাতে বালিকা পতিগৃহে কোন প্রকার নিন্দিতা হইবার নহে। কিন্তু পিতার প্রাণ কন্যার জন্য এরূপ ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত যে, তিনি বারম্বার বৈবাহিক ঠাকুরাণী এবং অন্যান্য সকলকে সাধনার প্রতি সদয় নেত্রে দৃষ্টিপাতের জন্য অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। পরে যতই তিনি বালিকার শ্বশুর গৃহে সুখ্যাতির কথা শুনিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার আনন্দের বৃদ্ধি হইল।

এদিকে সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত রমাকান্তের বিশেষ সখ্যতা ও সদ্ভাব ছিল, সে সাতিশয় আমোদ-প্রিয় হইলেও বয়োবৃদ্ধি সহকারে সুস্থ হওয়ায় লেখাপড়ায় তাহার বিশেষ যত্ন ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল। লেখাপড়া ব্যতীত তাহার অন্য কোন আমোদ আহ্লাদও ছিল না, কেবল সময়ে সময়ে সে ফুলের গাছ, লাল মাছ প্রভৃতি লইয়া তাহার বিশ্রাম সময় কাটাইত। ব্রজেশ্বরের বড় ইচ্ছা যে, তিনি পুত্রকে রীতিমত লেখাপড়া শিখান। বালক কিন্তু সেই সময়ে পিতার উপার্জ্জনের হ্রাস দেখিয়া বাটীতে আর শিক্ষকের প্রয়োজন নাই, পিতৃ সমীপে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল, সৌভাগ্য ক্রমে শিক্ষক মহাশয়েরও সেই সময়ে স্থানান্তরে একটী কার্য্য জুটিল, তাহাতে তাঁহার অপেক্ষাকৃত আয়ের বৃদ্ধি হইল, তিনি স্বয়ংই রায় মহাশয়ের সমীপে কর্ম্মত্যাগের প্রস্তাব করিলে, ব্রজেশ্বর শিক্ষক মহাশয়ের পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিদায় দিলেন। পুত্র সেই সময় হইতেই বাটীতে শিক্ষকের বিনা সাহায্যে লেখা পড়া করিতে লাগিল, মধ্যম পুত্রটী এখনও বঙ্গ-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয় নাই, ব্রজেশ্বর স্বয়ং তাহাকে ক, খ পড়াইতে লাগিলেন। পিতার যত্নে স্বল্প দিনেই বালকের

বর্ণ-পরিচয় হইল। রমাকান্তও নিজের পাঠান্তে অবকাশ সময়ে ভ্রাতা ভগ্নী লইয়া নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিত।

ইংরাজী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হওয়াবধি রমাকান্তের স্বাস্থ্যলাভ হইয়াছিল, একারণ বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ সহ লেখা পড়ায় উন্নতিলাভ করিয়াছিল; রমাকান্ত যে বৎসর ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ব্রজেশ্বর সেই বৎসর পুত্রের মহা সমারোহে বিবাহোৎসব সম্পন্ন করেন।

সাধনার সাতিশয় কোমল প্রকৃতি, ভাল মন্দ বিচার শক্তি সত্বেও বুদ্ধিমতী শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বা তৎসদৃশা গুরুজনের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিত। সাধনা মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী লইয়া যেরূপ স্বচ্ছন্দে আনন্দে দিনাতিপাত করিত, পতি-গৃহেও শ্বশুর শ্বাশুড়ী স্বামী, দেবর ও ননদিনী লইয়া সেই ভাবে কাটাইত। বিবাহের দিন হইতে সাধনা অত্যন্ত মৌনবতী হইয়াছিল, মায়াসুন্দরী বধূমাতাকে এরূপ—লজ্জাশীলা দেখিয়া সকলের সহিত কথা কহিবার জন্য একদিন বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। বহু দিবসাবধি পিত্রালয়ের সংবাদ না পাইয়া সাধনা একদা ম্লান-মুখে বসিয়া আছে, পিত্রালয়ে কে কেমন আছে, সংবাদ কারণ তাহার মন উৎকণ্ঠিতা হইয়াছে, যুবতী চিন্তাস্রোতে ভাসিতেছে দর দর ধারে নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, এক ধারার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য ধারা আসিতেছে, রমণী সঙ্গোপনে নয়নবারি মুছিতেছে, সহসা মায়াসুন্দরী তাহা দেখিতে পাইলেন। সাধনা কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া চক্ষুজল মুছিয়া ফেলিল; কিন্তু বুদ্ধিমতী মায়াসুন্দরী বধূমাতা যে রোদন করিতেছিল এবং তাঁহাকে দেখিয়া নয়নবারি

মুছিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তিনি সস্নেহে কহিলেন, "বৌ মা! কাঁদিতেছ কেন? তোমার দাদা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছে, সুধারাম বাহিরে রমাকান্তের সহিত কথা কহিতেছে, এখনই আসিবে।" সাধনা উৎকণ্ঠিতাচিত্তে কহিল, "মা! সত্য সত্যই কি দাদা আসিয়াছেন! অনেক দিন মা বাপের কোন সংবাদ পাই নাই।" এই কয়েকটী কথা বলিয়াই সাধনা নীরব হইল। মায়াসুন্দরী বধূমাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে একান্ত অভিলাষী ছিলেন, সাধনার মুখের কয়েকটী কথা শুনিয়া তিনি অপার আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন। এইক্ষণ হইতে সাধনা বিশেষ আবশ্যকমতে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিত; কিন্তু বয়োপ্রাপ্তা হইয়াও তাঁহার যথাযোগ্য মান্য দানে কদাচ অন্যথা করে নাই।

সুধারাম সাধনার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, যুবতী সর্ব্বাগ্রে আত্মীয় স্বজনের সংবাদ লইল, পরে কথায় কথায় সুধারাম ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাধনা! তুমি দিন দিন রোগা হইতেছ কেন? তোমার সে শ্রী ছাঁদ কোথায় গেল!" ভ্রাতার কথায় সাধনা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, দাদা! জানি না কেন আমার শরীর খারাপ হইতেছে, খাওয়া দাওয়া সমান রহিয়াছে; কিন্তু শরীর যেন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

সুধা। আমার বোধ হয়, তোমার শরীরে কোন রোগ জন্মিয়াছে, নতুবা এমন হইবে কেন? তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিতেছে। অনেক দিনের পর তোমায় দেখিতে আসিলাম, ভাবিয়াছিলাম তোমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইব, সুখী হইব; কিন্তু তাহা না হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

সাধনা। দাদা! সময়ে সময়ে সংবাদ লইও; আমি মেয়েমানুষ, ইচ্ছা হয় সদা সর্ব্বদা তোমাদের সংবাদ লই; কিন্তু আমি পরাধীনা, মনের উদ্বেগ মনেই সম্বরণ করি। এখানে সকলেই আমায় আদর যত্ন করেন, ভালবাসেন; কিন্তু তোমাদের সংবাদ না পাইলে প্রাণ কেমন করে!

এই ভাবে সাধনার সহিত সুধারামের অনেক কথাবার্ত্তা হইল, সাধনা পিতৃ-গৃহের কথা কহিতে কহিতে নয়নজলে ভাসিল, সুধারাম ভগ্নীর নয়ন-বারির সহিত নয়নাশ্রু মিশাইলেন, ভাই ভগ্নী উভয়ের কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ আসিয়া মাতুলের হস্ত ধারণ করিল। সুধারাম ভাগিনেয়কে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, বালক আধ আধ কথায় কত কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সুধারাম যাহা বুঝিলেন বা বুঝিতে পারিলেন না, ভাগিনেয়ের সব কথায় তাহার মনোমত উত্তর দিয়া প্রীত করিলেন, সুধারাম ভাগিনেয়ের জন্য খেল্না আনিয়াছিল, তাহা জামার জেব হইতে বাহির করিয়া বালকের হস্তে দিলেন, মহেন্দ্রনাথ খেল্না পাইয়া মাতুলের ক্রোড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া সত্বর গৃহ হইতে গৃহান্তরে চলিয়া গেল, তৎপরে ভাই ভগ্নীতে পুনরায় কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপ হইল।
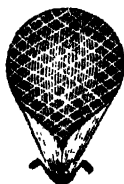
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যতই দিন যাইতেছে, ততই কৃষ্ণলালের পোষ্যবর্গের বৃদ্ধি হইতেছে; কৃষ্ণলাল নিরীহ প্রকৃতির লোক, ধর্ম্মপথে থাকিয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতেই এক প্রকার দুঃখে কষ্টে তাঁহার দিন কাটিয়া যায়, তিনি পরিমিত খরচ পত্র করিতে কোন অংশেই কুণ্ঠিত নহেন। সাধনার বিবাহ কালে তাঁহার যাহা সংস্থান ছিল, তৎসমস্ত ব্যয় করিয়াও তিনি কতক পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। লোকের নিকট ধার পাইলেই ধার লওয়া তাঁহার চির বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু কন্যা-দায় হইতে উদ্ধার কারণ তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় নাই। মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, মাসিক উপার্জ্জন হইতে সংসারিক ব্যয় কমাইয়া কিছু কিছু করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন; কিন্তু পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ঋণ পরিশোধ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। একে অল্প আয়, তাহাতে মাসিক সুদ ও অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় তিনি একান্ত ভাবিত হইয়া পড়িলেন। দুই ভ্রাতার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি ভাগ হইয়া গিয়াছে, পরস্পর

একত্র বসবাস লোপ পাইয়াছে। কোন কাজ কর্ম্ম উপস্থিত হইলেই, কৃষ্ণলাল সর্ব্বাগ্রে জ্যেষ্ঠের অনুমতি লইতেন, শ্যামলাল ভ্রাতাকে যে ভাবে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেন, তৎপ্রতি দ্বিধাশূন্য হইয়া তিনি অকপটচিত্তে তৎসাধনেই উদ্যোগী হইতেন। কি প্রকারে কোন্ উপায়ে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারেন, কৃষ্ণলাল অনেক ভাবিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। ভ্রাতার নিকট ঋণের কথা উত্থাপন করিলে হয়ত তিনি তাঁহাকে দায় হইতে মুক্ত করিতে পারেন। কৃষ্ণলাল অনেকগুলি পোষ্য লইয়া সংসার জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছেন, ভ্রাতার একমাত্র সহধর্ম্মিণী ও দুইটী পুত্র ব্যতীত আর কেহই নাই, অথচ তাঁহার অর্থের অভাব নাই, তিনি মনে করিলে কৃষ্ণলালের মত বিশ পঁচিশ জনকে এরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। পৃথক হওয়াবধি তাঁহার সহিত কৃষ্ণলালের যেরূপ ভাব চলিতেছে, তাহাতে তাঁহার নিকট এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে কৃষ্ণলালের সাহস হয় না। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া ভ্রাতার সমীপে সকল কথা জানাইতে উদ্যোগী হইলেন, এরূপ অবস্থায় তিনি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া কল্পনা কার্য্যে পরিণত করণে উদ্যোগী হইলেন, মনে মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিলেন, ভ্রাতার গোচর ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

সাধ্বীসতী পতিব্রতা সরলা স্বামীর চিত্তবিকার পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সংসার যাত্রা সংক্ষেপে নির্ব্বাহ কারণ যতদূর সাধ্য রমণীর চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী ছিল না; কিন্তু আহারাদি ও পরিধেয় বস্ত্র যাহা না হইলে নয়, তাহার আর কি সংক্ষেপ করিবেন? গহনাপত্র ভবিষ্যতের সংস্থান; কিন্তু বর্ত্তমান অভাবানলে

দগ্ধ বিদগ্ধ হওয়াপেক্ষা তিনি সে সমস্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিতেন, যাহা কিছু স্বর্ণালঙ্কার ছিল, তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া উপস্থিত ঋণদায় হইতে মুক্তির জন্য তিনি স্বেচ্ছায় পুনঃ পুনঃ স্বামীকে অনুরোধ করিলেন, কৃষ্ণলালের সকল বিষয়েই সম্যক দৃষ্টি ছিল, প্রাণ প্রতিমা সংসার সঙ্গিনী সরলা তাঁহাকে সুখ সচ্ছন্দে রাখিতে একদিনের জন্যও ত্রুটি করেন নাই, গৃহিণীর একমাত্র তত্ত্বাবধারণে তাঁহার দুঃখের সংসার সুখে চলিয়া যাইতেছে, লৌকিক সামাজিক সকল দিক গৃহিণীই রক্ষা করিতেছেন, এরূপ অবস্থায় কি প্রকারে তিনি তাঁহাকে একে- বারে নিরলঙ্কারী করিবেন? তাহাতে যে যে ভূষণে সরলা সজ্জিতা আছেন, তাহার একখানিও রহিত করিবার নহে। হাতের বালা ও অনন্ত, গলার হার, কোমরের গোট প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয়, কৃষ্ণলাল ইহার কোন্‌খানি লইয়া কোন্ খানি রাখিবেন? এককালে সমস্তগুলি বিক্রয় করিলে তিনি ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ কৃষ্ণলাল সাধ্বীসতীর অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইতে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। উপস্থিতে তাঁহার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যে ভবিষ্যতে সরলাকে স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা করিবেন, সে আশা তিনি চির-বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কৃষ্ণলালের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যাহা যাইবে আর তাহা এ জীবনে হইবে না, দিন দিন অবনতিস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। ঋণদায়ে জড়িত হইয়া তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া এক দিবস অপরাহ্নে জ্যেষ্ঠের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। জীবনের শেষ দশায় বিপুল সম্পত্তির আয় হইতে শ্যামলালের সুখসচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইতেছে, সন্ধ্যার পর বৈঠকখানা গৃহে পাঁচ সাতজন সম-

বয়স্ক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়া থাকে, তাহাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে শ্যামলালের সময় কাটিয়া যায়। কৃষ্ণলাল প্রার্থী হইয়া ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, বৈঠকখানা গৃহে তাঁহার অপরিচিত লোকদিগের সহিত জ্যেষ্ঠ ক্রীড়া কৌতুকে নিমগ্ন রহিয়াছেন, এ সময়ে তাঁহাকে মনোভাব প্রকাশ করিতে কৃষ্ণলাল কথঞ্চিত কুণ্ঠিৎ হইলেন, কিন্তু যেরূপ বিপন্ন হইয়া ভ্রাতার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে মান সম্ভ্রমের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই বলিলেই হয়। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই মনে মনে অপ্রতিভ হইলেন, সহসা কি যেন ঘোর ভাবান্তর তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে বিকাশ পাইল; কিন্তু তিনি পরক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণলাল গৃহে প্রবেশ করা মাত্রেই শ্যামলালের তাঁহার প্রতি লক্ষ্য হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ক্রীড়ায় ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত ভ্রাতাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই; কৃষ্ণলাল আসন গ্রহণ করিলে শ্যামলাল ভাবিলেন অবশ্যই ভ্রাতার কোন আবশ্যক আছে, নতুবা এমন সময়ে কৃষ্ণলাল এখানে আসিবে কেন? তিনি এইরূপ মনে করিয়া ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণলাল! খবর কি?

কৃষ্ণ। আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত মঙ্গল, কৃষ্ণলালের কথা শেষ হইতে না হইতে শ্যামলাল বলিলেন, "আর ভাই! যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে প্রাণে প্রাণে রক্ষা হইলেই যথেষ্ট।"

কৃষ্ণ। আজ্ঞে আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য; কিন্তু যোগে যাগে দিন কাটানও দায়।

শ্যাম। তুমি যাহা বলিতেছ সকলই ঠিক, বর্ত্তমানে দেশকাল পাত্র যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাতে দিন চলাই ভার হইয়াছে, তুমি আমি কেন, পৃথিবীর সকলেই এখন সংসার

জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেছে, যাহার যেমন আয়, তাহার তেমনই ব্যয় দাঁড়াইয়াছে।

কৃষ্ণ। দাদা! দুঃখে কষ্টে সংসার-যাত্রা একরূপ নির্ব্বাহ হইবে, ভগবান দিন দিলে কিসের অভাব? ঈশ্বর করুন ধনরাম সুধারাম ইহারা মানুষ হইয়া উঠুক, চিরকাল কি আর এই ভাবে যাইবে? যাহা হউক আপনার সহিত একটা কথা আছে, যদি একবার গা তোলেন।

কৃষ্ণ। তোমার যাহা বলিবার আছে সচ্ছন্দে এখানে বলিতে পার। যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন, সকলেই আমার বিশেষ বন্ধু ও আপনার লোক। ইহাদের সাক্ষাতে কোন কথা প্রকাশ করিলে অপর লোকে জানিতে পারিবে না, আর তোমারও তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

কৃষ্ণ। আপনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ; আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, আমি তাহা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া অবনত মস্তকে বহন করিব।

শ্যাম। ভাল তোমার কি বলিবার আছে, সবিশেষ বল, সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।

কৃষ্ণ। দাদা! আপনি যখন সাহস দিতেছেন, তখন আমার আর বলিতে ভয় কি? আপনার মানে আমার মান।

শ্যাম। কৃষ্ণলাল আমার নিকট তোমার ওরূপ সঙ্কুচিত হইয়া কথা কহিবার প্রয়োজন নাই; যাহা বলিবার আছে নির্ভয়ে বলিতে পার।

কৃষ্ণ। কথা এই যে, সাধনার বিবাহ সময়ে আমি এক জন লোকের নিকট হইতে ৭৫০ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম, সে টাকা আজ পর্য্যন্ত পরিশোধ হয় নাই, দুঃখে কষ্টে মাসে মাসে সুদ যোগাইতেছি। কিন্তু মহাজন মূলধনের জন্য বড়ই

পীড়ন করিতেছেন, তিনি অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর, অথচ কেন যে আমাকে এরূপ পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এখন আপনি ভিন্ন কে আমাকে এ দায় হইতে মুক্ত করিবে? বিষয় বুদ্ধি সহায় সম্পত্তি আমার সমস্তই আপনি।

শ্যাম। কৃষ্ণলাল! তুমি ঠিক কথাই বলিতেছ, সাধনা আমার বড় আদরের সামগ্রী, তাহার বিবাহে তুমি যে ঋণ-জালে জড়িত হইয়াছ, প্রকৃত পক্ষে সে দায় তোমার নহে, আমার; কিন্তু আপাতত আমার বড়ই টানাটানি যাইতেছে, যত্র আয় তত্র ব্যয়। পয়সার সংস্থান হইতেছে না, এরূপ স্থলে আমি তোমার কথার এক্ষণে কোনই উত্তর দিতে পারিলাম না, সময়ান্তরে দেখা করিও।

কৃষ্ণ। না হয়, একবার যদি রাধিকা বাবুকে বলিয়া কার পীড়াপীড়ি হইতে দিনকতক রক্ষা করেন, তাহা হইলেও বিশেষ উপকার হয়।

শ্যাম। আর ভাই,দিন-কাল যে রকম পড়েছে, তাহাতে কেউ কাহার কথা রাখে না, মিছে মান খোয়ান, আচ্ছা দেখা যাবে।

ভ্রাতার কথায় কৃষ্ণলাল বিস্মিত হইলেন, পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত তাঁহার কাঁপিতে লাগিল। তিনি জ্যেষ্ঠের অবস্থা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন, তাঁহার নিকট দুঃখ কাহিনী প্রকাশ করিলে অবশ্যই অভাব মোচন হইবে, তাঁহাকে বৈমুখ হইতে হইবে না, কৃষ্ণলাল মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ বিষয় জ্যেষ্ঠের কর্ণগোচর হইবা মাত্রেই তাঁহার মুখ রক্ষা হইবে; তিনি উত্তমর্ণের ঋণদায় হইতে উদ্ধার হইবেন। কিন্তু কৃষ্ণলালের সকল আশা

ভরসা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জ্যেষ্ঠ প্রমুখাৎ এইরূপ কয়েকটী কথা শুনিয়াই এককালে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। গৃহে অন্যান্য লোক বসিয়া রহিয়াছেন, সকলের সম্মুখে জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে এরূপ উত্তর দিলেন, ইহাতে তাঁহার সমধিক দুঃখের বৃদ্ধি হইল; তিনি গোপনে দুই দশ ফোঁটা অশ্রুবারি বর্ষণ করিলেন, পরক্ষণে মনের উদ্বেগ মনেই সম্বরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন; কিন্তু তথায় আর অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্যামলালের বৈঠকখানা হইতে কৃষ্ণলাল নিষ্ক্রান্ত হইলে তাঁহারই কথাবার্ত্তা লইয়া বহুক্ষণ আন্দোলন হইতে লাগিল. যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেই ভাবেই কৃষ্ণলাল সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। শ্যামলাল যে যাহা বলিল, সকলই শুনিলেন বটে; কিন্তু কাহার কথায় বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না, কনিষ্ঠ সাতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইতে আসিয়াছিল, বিপন্ন ভ্রাতাকে তিনি অনায়াসেই সাহায্য করিতে পারিতেন, গৃহিণীর একমাত্র ভয়ে তাঁহার সে সাহস হয় না, এইরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন।

কৃষ্ণলাল শ্যামলালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময়ে কত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন, একে কর্ম্ম স্থানে সারা দিন পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়াছিল, তাহাতে জ্যেষ্ঠের নিকট বড় মুখ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্যামলাল তাঁহার আশায় নৈরাশ করিয়াছেন, একারণ তাঁহার যেরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কথায় ব্যক্ত হয় না, তিনি অচিরে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে প্রণয়িণী মনে ব্যথা পাইবেন,

উদ্বিগ্নচিত্তে বিলম্বের সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে তিনি কি প্রত্যুত্তর দিবেন? স্ত্রী পুনঃ পুনঃ ঋণের কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আপনার অলঙ্কার কয়েকখানি বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধের উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা তিনি করেন নাই, তাঁহার মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভ্রাতা কখনই তাঁহাকে বৈমুখ করিবেন না, অপরের নিকট টাকার কথা উত্থাপন করিলে নানা ওজর আপত্তিতে তাঁহাকে বৈমুখ করিতে পারে; কিন্তু জ্যেষ্ঠের নিকট তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ মনোরথ হইবেন, এই সকল ভাবিয়া তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট যে অর্থ প্রার্থনা করিবেন, একথা সহধর্ম্মিণীকেও উল্লেখ করেন নাই। অদ্য যে মন ব্যথা পাইয়াছেন, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সম্ভবতঃ অপ্রকাশ থাকিবে না, এই ভাবনাতেই কৃষ্ণলালের চিত্ত উদ্বেলিত হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন যে, বাটীতে আর প্রবেশ করিবেন না, যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন, লোকালয়ে তাঁহার মুখ দেখাইতে আর প্রবৃত্তি নাই, পরক্ষণে তাঁহার মনে হইল যে, এখন তিনি ঋণজালে আবদ্ধ রহিয়াছেন, এ সময়ে স্থানান্তরিত হইলে লোকে অধিকতর দুর্নাম ঘোষণা করিবে মাত্র। তিনি সংসারের অধিকারী হইয়াছেন, পুত্র কলত্র পরিবারবর্গ সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবাহী ও অনুগত, তিনি একদিনের জন্য কাহারও কুচরিত্র বা যথা নিয়মের অন্যথা দেখেন নাই, তিনি যদি এ সময়ে কোথাও চলিয়া যান, তাহা হইলে পরিবারবর্গ অনাথা হইয়া পড়িবে। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান নাই, সকলেই একমাত্র তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, তাঁহাকেই সকল করিতে হইবে নচেৎ অবশ্য কর্ত্তব্য অপালন জনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে।

এই সকল মনে মনে আন্দোলন করিয়া তিনি বহুক্ষণ পরে বাটী গেলেন। কর্ম্মস্থান হইতে বাটীতে আসিয়া তিনি সে দিন বস্ত্র ত্যাগ করতঃ আহারাদি কিছুই করেন নাই; উদ্বেগ চিন্তা মনোবেদনায় তাঁহার পথিমধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল কাটিয়া গিয়াছিল, একারণ কৃষ্ণলাল রাত্রি দশটার সময়ে বাটিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

স্বামীকে সমাগত দেখিয়া, সরলা উৎকণ্ঠিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়াছিলে?"

কৃষ্ণ। এইখানেই গিয়াছিলাম।'

সর। আজ কাপড় ছাড়িয়াই বেকলে, জলখাবার তোমার পড়ে রইলো, এত কিসের কাজ?

কৃষ্ণ। ক্ষুধা আজ হয় নাই বলিয়া জল খাই নাই আর আজ আমার শরীরটা ভাল নাই।

সর। দিন দিন তোমার শরীর খারাপ হইয়া যাইতেছে, এ সময়ে শরীরের প্রতি দৃষ্টি না রাখলে, হয়ত কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইতে পার।

কৃষ্ণ। যে দিন যাহা হইবার তাহা হইবে; তুমি আমি কি তাহা নিবারণ করিতে পারিব!"

সরলা মনে মনে স্থির জানিলেন যে, স্বামী একমাত্র ঋণ-জালে জড়িত হইয়া এরূপ ম্লান-ভাব ধারণ করিতেছেন, নিশ্চয়ই তিনি কোথাও টাকার চেষ্টায় গিয়াছিলেন, তাহাতেই আসিতে এরূপ বিলম্ব হইয়াছে। বেলা নয়টার সময় আহার করিয়া কর্ম্মস্থানে গিয়াছিলেন, রাত্রি সাড়েদশটা বাজিয়া গিয়াছে, এখনও জলগ্রহণ করেন নাই, এ সময়ে পতিকে কোন কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার মন অধিকতর ব্যথিত হইবে, এখন কোন কথায় প্রয়োজন

নাই। তিনি সত্বর স্বামীর আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুধারাম ভ্রাতাদিগকে লইয়া বাহিরের ঘরে লেখাপড়া করিতেছিলেন, পিতা বাটীতে প্রবেশ করিলে তিনি ভ্রাতাগণকে লইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, মাতাকে পিতার আহারাদির উদ্যোগ করিতে দেখিয়া, স্বয়ং পিতার হাত পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন।

কৃষ্ণলালের মন বিষাদ-সমুদ্রে ভাসিতেছিল, তাঁহার এখনও আহার হয় নাই বলিয়া পুত্রকলত্রকে বিশেষ ব্যস্ত দেখিয়া তিনি নয়নাসার আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, দর দর ধারে অশ্রুধারা বর্ষিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার মুখের প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িলে সে প্রাণে ব্যথা পাইবে, এজন্য তিনি যতদূর সাধ্য নিজেই যন্ত্রণা ভোগ করিলেন,অন্যে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত করিতে দেখিলে তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে, একারণ তিনি বহুকষ্টে গোপনেই নয়ন জল মুছিয়া ফেলিলেন, আহারাদি না করিলে. পরিবারবর্গের অধিকতর সন্দেহের বৃদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া তিনি হস্ত পদাদি প্রক্ষালনান্তে আহার করিতে বসিলেন, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বালক বালিকাগণ বেষ্টন করিয়া বসিল, গৃহিণী পরিবেশন করিতেছেন, নিত্য যেমন আহার সামগ্রীর উদ্যোগ হইয়া থাকে, আজও সেইরূপ হইয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণলালের উদ্বেগ ও চিন্তায় উদর পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি পরিবারবর্গের মনোরঞ্জন কারণ আহার করিতে বসিলেন বটে; কিন্তু কিছুই আহার করিতে পারিলেন না, সহধর্ম্মিণীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে যৎসামান্য আহার করিলেন। বালক-বালিকাগণের ইতিপূর্ব্বেই আহারাদি হইয়াছিল, তাহারা অন্য দিন সে সময়ে নিদ্রা যাইত; সে দিন পিতা তখনও গৃহে আসেন নাই, একারণ সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে

তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল। পিতার আহারান্তে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শায়িত হইল। সরলা স্বামীর পাতেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। পতির আহার হইল না, দিন দিন তাঁহার শরীর শুকাইয়া যাইতেছে, এই সকল চিন্তায় তাঁহারও সে দিন ভাল আহার হইল না। সরলা মনের ক্ষোভ মনেই রাখিয়াছিলেন।

গৃহস্থালীর কার্য্যাদি সমাপন করিয়া সরলা শয়ন করিলেন। রমণী স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, কোন স্থানে টাকার চেষ্টা করিয়া নিস্ফল হওয়াতে স্বামীর এরূপ চিত্তের অশান্তি হইয়াছে; কিন্তু পতির ভাব গতিক দেখিয়া, তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। কৃষ্ণলাল মনের দুঃখে রোদন করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি একরূপ জাগ্রত অবস্থায় যাপন করিলেন। সরলা এক একবার উঠিয়া কৃষ্ণলালের মর্ম্মযাতনার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে কৃষ্ণলালের এক পরিচিত দালাল আসিয়া কহিল, শুনিলাম! আপনি বাটী বন্ধক দিয়াছিলেন, মহাজনের পিড়াপিড়িতে তাহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। যদি বিক্রয় করা স্থির হয়, তবে আমাকে বলিবেন কত হইলে ছাড়িবেন। আর দেখিলাম শ্যাম বাবু রাধিকা বাবুব নিকট আনা গোনা করিতেছেন, তাঁহার অভিপ্রায় সুবিধা দরে তিনি লন। মহাশয় যদি আমাকে বলেন, আমি দরে বেচিয়া দিতে পারিব, কৃষ্ণলাল অবাক্ হইয়া কহিলেন, বিক্রির এখন বিলম্ব আছে, পরে তোমাকে বলিব। দালালকে বিদায় দিয়া কৃষ্ণলাল দাদার কথা আন্দোলন করিয়া সংসার অরণ্য অপেক্ষা ভয়াবহ স্থান মনে-করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রমাকান্ত ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তিনি পঠদ্দশায় অর্থোপায় চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ায় তাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারিলেন না। শাসন ভয়ে যদিও রমাকান্ত বিপথগামী হইতে পারে নাই, তথাচ যৌবন-চাপল্যের বশবর্ত্তী হইলে যে সকল দোষ ঘটিতে পারে। একে একে সকলগুলিই রমাকান্তে বর্ত্তিয়াছিল; এরূপ অবস্থায় উন্নতিলাভের পক্ষে রমাকান্তের বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। জনসমাজে তাহার স্বভাব চরিত্রের কোন প্রকার কলঙ্ক প্রচার না হইলেও, সে যে উত্তরোত্তর কুচরিত্র হইয়া পড়িতেছে, তাহা তাহার বুদ্ধির অগম্য ছিল না।

ব্রজেশ্বর নিজে লেখাপড়ায় পারদর্শী হইতে পারেন নাই, একারণ তাঁহার ইচ্ছা যে, পুত্রদিগকে সুশিক্ষিত করেন; তিনি বিদ্যালয়ের বেতন ও পাঠ্য-পুস্তক যোগাইতে কোন অংশে ত্রুটি করিতেন না; কিন্তু এক্ষণে রমাকান্ত উপযুক্ত হওয়ায় ব্রজেশ্বর পুত্রের

প্রতি খরচ পত্র এককালে বন্ধ করিলেন, বিদ্যালয়ের বেতন এবং পড়িবার আবশ্যকীয় পুস্তকের জন্য রমাকান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে লোকের বাটিতে ছেলে পড়ান কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল, যে দিবস হইতে সে এইরূপ শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইল, সেই সময় হইতেই মাসিক কিছু কিছু খরচ সংসার কারণ তাহাকে যোগাইতে হইত। আবার সাধনা তাঁহার নবপরিণীতা স্ত্রী, যদিও রমণীর মুখ হইতে রমাকান্ত কোন জিনিষ পত্রের প্রয়োজন জ্ঞাত হয় নাই, তথাচ সময়ে সময়ে সাবান, চিরুনী, মস্তকের জ্যারি, ফিতা প্রভৃতি তাহাকেই যোগাইতে হইত। যাহা আয় হইত, তাহা সমস্তই পিতৃ সংসারেই ব্যয় হইয়া যাইত; এদিকে স্ত্রীর খরচ ওদিকে বিদ্যালয়ের ব্যয়, তাহা ছাড়া বন্ধু-বান্ধবের হিসাবেও কিছু কিছু খরচ পত্র হইত। অগত্যা সে ঋণগ্রস্ত হইয়া এই সকল যোগাইত; কিন্তু এরূপ অবস্থায় আর কত দিন চলে, সে আর এক স্থানে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইল, অর্থোপায় কারণ চারি পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া রমাকান্ত নিজের পাঠে তাদৃশ মনোযোগী হইতে পারিল না, অথচ সাধ্যমত চেষ্টারও কোন অংশে ত্রুটি করিল না। পুত্র যে পয়সার জন্য লেখাপড়ায় উদাসীন হইতেছে, দিন দিন তাহার পাঠে অমনোযোগ হইয়া আসিতেছে, সুবুদ্ধি ব্রজেশ্বর সবিশেষ জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিলেন না, অধিকন্তু তিনি সংসারের খরচ পত্র লইয়া গৃহিণীর সহিত বাদ বিসম্বাদ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। যুবক প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কথঞ্চিৎ আমোদপ্রিয় হওয়ায় ব্রজে-শ্বরের বিরক্তির কারণ হইয়াছিলেন; রমাকান্ত পিতার সহিত কথাবার্ত্তায় বা দেখা সাক্ষাতে বিশেষ সতর্ক থাকিলেও ব্রজে-

শ্বরের মনে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার ইচ্ছা পুত্র বালকের মত বাধ্য থাকিবে, বাটী হইতে কোথাও যাইতে পারিবে না, তাহার কোন বন্ধু বান্ধব দেখা সাক্ষাৎ করিতে বাটীতে আসিতে পারিবে না, অধিকন্তু পুত্র রাত্রি দিন লেখাপড়ায় নিযুক্ত থাকিবে। "প্রাপ্তেতু ষোড়শ-বর্ষে পুত্রং মিত্রং বদাচরৎ" সে বিষয়েও ব্রজেশ্বরের ক্রটি ছিল, একারণ পিতা পুত্রে সময়ে সময়ে মনান্তর হইত; কিন্তু পরক্ষণেই সেই ভাব বিলীন হইয়া যাইত।

ব্রজেশ্বর ও রমাকান্ত ইহাদের পিতা-পুত্রের দুইটী গৃহ, সময়ে সময়ে কোন জামাতা বাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে একটী গৃহ ছাড়িয়া দিতে হয়. এই সকল কারণে ব্রজেশ্বর বাটীর সংস্কারের সঙ্গে দুইটী নূতন গৃহ প্রস্তুত করাইতে-ছেন; মাল পত্র আনা, মিস্ত্রী খাটান তাঁহারই তত্ত্বাবধারণে চলিতেছে। এক দিন তিনি উপস্থিত নাই, এমন সময়ে দুই গাড়ী সুরকী আসিল, রমাকান্ত পিতার অমতে কোন কার্য্যই করে না; কিন্তু সে দিবস বাটীর মিস্ত্রী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় সে সুরকির চালান ও হাতচিঠায় স্বাক্ষর করিয়াছিল। ব্রজেশ্বর বাটীতে আসিলে পুত্র সকল কথাই জানাইলেন; পুত্রের প্রতি পিতা এককালে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কথায় কথায় দুই একটী রূঢ় কথাও রমাকান্তকে শুনিতে হইল, রমাকান্ত ব্রজে-শ্বরকে বিশেষ ভয় করে, কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া অকা-রণ এরূপ তিরস্কারে মনোক্ষুণ্ণ হইল, কথায় কথায় পিতা-পুত্রে কথান্তর হইয়া গেল। ব্রজেশ্বর ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে বলিলেন, রমাকান্ত নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল, মনে মনে ভাবিল, উপায়ক্ষম হইলে, তাঁহাকে এ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না।

সে সেই দুঃখ কষ্টে ও মনোবেদনায় দুই তিন দিন বাটী আসিল না। গৃহে শান্তি ও সুখ না পাইলে মানুষ স্বভাবতঃ অন্যত্র সুখের অন্বেষণ করে। এই কারণেই লোক গৃহ ত্যাগ করিয়া ভয়াবহ অরণ্যেও বাস করিতে সম্মত হয়। তাই রমাকান্তও গৃহ ত্যাগ করিয়া শান্তি-মঠে শান্তি লাভ করিতেছিল।

মায়াসুন্দরীর সাতিশয় সরল প্রকৃতি; কিন্তু স্বামীর কথা বা কার্য্য কোন প্রকারে অন্যথা করিবার তাঁহার সাধ্য ছিল না। তিনি রমাকান্তের জন্য অধীরা হইয়া তাহার একটী বন্ধুর সাহায্যে নানা কৌশলে তাহাকে মঠ হইতে বাটীতে আনাইলেন। তৎপরে যখন দেখিলেন এবং বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামীর ইচ্ছা রমাকান্ত সংসারের খরচ পত্রের অধিক পরিমাণে সাহায্য করে, তখন তিনি এক দিন রমাকান্তকে সকল কথাই জানাইলেন; রমাকান্ত গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদানে কখন অবহেলা করে নাই।

এক্ষণে জননী প্রমুখাৎ পিতার ভাবগতি শুনিয়া কথঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, সহসা মনোমধ্যে তাহার আক্ষেপের সঞ্চার হইল; কিন্তু পরক্ষণে তাহার সে ভাব আর থাকিল না। সে ভাবিল, পিতা-মাতা বহু কষ্টে লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুগ্রহেই সে সংসারী হইয়াছে, পিতা-মাতা পরিণামে সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পুত্রের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে মতান্তর করা তাঁহার কোন অংশে কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ ভাবিয়া রমাকান্ত উত্তর করিল, "মা! আমার যেরূপ বয়স হইয়াছে, সেরূপ লেখাপড়া হয় নাই, বাবার আয় এককালে কমিয়া আসিয়াছে; তাঁহার এ সময়ে পূর্ব্বমত উপার্জ্জন থাকিলে আমার আয়ের প্রতি তিনি কদাচ লক্ষ্য করিতেন না, অবশ্য তাঁহার এ কথা

যুক্তি-সঙ্গত। যাহা হউক, আর আমার বিদ্যালয়ে যাইতে প্রবৃত্তি নাই। আর এক কথা, আমি নিজেরও যেরূপ অবস্থা বুঝিতেছি, তাহাতে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব, সে আশাও আমার নাই, ভাল, যদি বাবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, আমি এই দণ্ডে লেখাপড়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

মায়া। না বাবা! আমার ইচ্ছা তুমি লেখাপড়ায় অযত্ন করিও না, আমি গায়ের গহনা বেচিয়াও তোমাদিগকে লেখা-পড়া শিখাইব, তুমি ভাল করিয়া পড়া শুনা কর, সময়ে অনেক পয়সা ঘরে আসিবে। তোমরা মানুষ হইলে আর আমাদের ভাবনা কি?

রমাকান্ত মাতার কথার আর কোন প্রত্যুত্তর করিল না, সে ভাবিল যে, স্নেহময়ী মাতার প্রাণ কোমলতা পূর্ণ, পুত্রের উন্নতি বিষয়ে তিনি কোন্ প্রাণে হন্তারক হইবেন? কিন্তু সংসারের দিন দিন খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় পিতার কষ্ট হইতেছে, তিনি লেখাপড়া বজায় রাখিয়া যৎসামান্য যাহা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহাতে সে অভাব পূরণ হইতেছে না; পিতার কাজকর্ম্ম নাই, সংসারের অসচ্ছলতা, নিজের খরচ ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে, তাহাকে এই খানেই লেখাপড়া সাঙ্গ করিতে হইবে, যদি পরমেশ্বর দিন দেন, তাহা হইলে সে অন্য উপায়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারিবে; কিন্তু আপাততঃ বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে না পারিলে আর উপায়ান্তর নাই। অগত্যা সে কার্য্য করিতে সম্মত হইল। কিন্তু চাকরীর বাজার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সহায় সম্পত্তি ব্যতিরেকে কোথায় কার্য্য পাইবেন? তাহার আত্মীয় স্বজন এমন কেহই ছিল না যে, সহায়তা করে। রমাকান্ত এই সকল ভাবিয়া হতাশ হইল এবং যত্ন

দিন না কাজ কর্ম্মের সুবিধা হয়, ততদিন সে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিল।

একদা রমাকান্তের মাতাঠাকুরাণী তাহার নিকট কিছু খরচ চাহিতে আসিয়াছেন, রমাকান্ত তখন ভাবনা-সাগরে ভাসিতেছিল, মাতার কথা সবিশেষ না শুনিয়াই বুঝিতে পারিল যে, তিনি টাকার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, হাতে একটীও পয়সা নাই, তথাপি মাতার নিকট মনোগত ভাব অপ্রকাশ রাখিয়া সে উত্তর করিল, "মা! তোমার যাহা যাহা আবশ্যক আমায় বলিয়া দাও, আমি এখনই আনাইয়া দিতেছি।" মায়াসুন্দরী রমাকান্তকে বিশেষরূপ চিনিতেন, বুঝি-লেন পুত্রের হাতে আজ কিছুই নাই, তিনি পুত্রকে বলিলেন, "ভাল! আজ না হয়, আমি যোগাড় করিয়া চালাইতেছি, তুমি কাল দিও" এই কয়েকটী কথা বলিয়াই তিনি গৃহে চলিয়া গেলেন। রমাকান্ত একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল। স্বামীর সহিত শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর যে কথা হইতেছিল, সাধনা অন্তরাল হইতে তৎসমস্তই অবগত হইয়াছিল। অভাব বশতই পতি অবশ্যই মনে মনে ব্যথা পাইতেছে, ব্যথার ব্যথী সাধ্বী সতী বিনা আর কাহার প্রাণ আকুল হইবে? সাধনা কার্য্যের ছল করিয়া পতি-গৃহে প্রবেশ করতঃ রমাকান্তকে চিন্তিত দেখিল, ভাবিয়াছিল যে, স্বামীই তাহার নিকট সকল কথা খুলিয়া জানাইবে, এজন্য সে আগে কোন কথাই বলিল না; কিন্তু পতিকে বিমর্ষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছ?" রমাকান্ত সাধনাকে গৃহমধ্যে আসিতে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সাধনা তাহার ভার গ্রহণ করিবে। একারণ অভাবের জন্য তাহার আর তত ভাবনা রহিল না, রমাকান্ত কথঞ্চিৎ

অপ্রতিভ হইয়া কহিল, সংসারের কিছু খরচ চাই, তাই মা আসিয়াছিলেন।

সা। আপাততঃ কয় টাকা আবশ্যক ?

রমা। আমিত বরাবরই বলি যে, তুমি দেখ তাই আছি ; আর আমায় লজ্জা দিও না ; এখন কি হইবে, কোন উপায় আছে কি ? তাই জানিতে ইচ্ছা করি।

"আচ্ছা দেখা যাইবে" এই কথা বলিয়া সাধনা গৃহ হইতে চলিয়া গেল, রমাকান্ত স্ত্রীর আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া সকল চিন্তা একেবারে দূরে নিক্ষেপ করিল। সংসার দায়ে যে কয়েকবার রমাকান্ত জড়িত হইয়াছে, সাধনা প্রতিবারেই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, এবারেও স্ত্রীই তাহার এক মাত্র ভরসা। সাধনা স্বামীর প্রদত্ত অর্থ হইতে যাহা কিছু বাঁচাইত তাহাই এইরূপ অভাব পড়িলে দিত।

ইদানিং মায়াসুন্দরী স্বামীর প্রদত্ত অর্থে এবং রমাকান্তের যৎসামান্য সাহায্যে দুঃখে কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ছিলেন, পিতা-পুত্রের আয়ে সঙ্কুলান না হইলে সময়ে সময়ে গৃহিণী, প্রতিবেশী রমণীবর্গের নিকট হইতে অলঙ্কার বন্ধক দ্বারা খরচ চালাইতেন, এইরূপ ভাবে তিন চারি বৎসর কাটিয়া যাওয়ায় মায়াসুন্দরীর অবস্থাও হীন হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর যাহা কিছু নগদ সম্পত্তি ছিল, তাঁহার অবর্ত্তমানে সমস্তই তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল ; কিন্তু সংসার অচল বলিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা নিঃশেষ হওয়ায় সময়ে সময়ে ঘর খরচের জন্য গায়ের গহনা বন্ধক দিতেন। যৎসামান্য খরচ দিয়াই ব্রজেশ্বর নির্লিপ্ত থাকেন, এক মাত্র মায়াসুন্দরীকে সংসারের জন্য ব্যস্ত হইতে হয়। মায়াসুন্দরী মনে মনে জানিতেন যে, রমাকান্তের কাজকর্ম্ম নাই, সে কিরূপে অধিক সাহায্য করিবে।

রমাকান্ত যে দিন হইতে সংসারের অভাব বুঝিতে পারিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার উপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে; কিন্তু ছেলে পড়ান ব্যতীরেকে অন্য কিছু কাজ কর্ম্ম সুবিধা করিয়া লইতে পারিতেছে না। ব্রজেশ্বরের সহিত অনেক গণ্য-মান্য লোকের আলাপ পরিচয় ছিল, তিনি দুই এক স্থানে পুত্রকে সঙ্গে লইয়াও উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহাদের নিকট পুত্রের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার প্রতি তাদৃশ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না, পরের দাস হইয়া জীবন যাপনে তাঁহার চির বিদ্বেষ, এরূপ অবস্থায় পুত্রের কর্ম্মের জন্য লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায় তিনি এক প্রকার ক্ষান্তই হইয়াছিলেন। কেহ কোন কাজের কথা কহিলে, রমাকান্ত সত্বর তাঁহার বাটীতে বা কর্ম্মস্থানে যাইয়া সাক্ষাৎ করে, উমেদারী করে; কিন্তু কার্য্যে কিছুই হয় না, অবশেষে জনৈক উদার প্রকৃতির প্রতিবেশী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ রমাকান্তকে এক স্থানে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কুড়ি টাকা আয় বাড়িল বটে; কিন্তু তাহাতেও সংসারের সকল খরচা কুলায় না, এজন্য রমাকান্ত তখনও ছেলে পড়ান কার্য্য পরিত্যাগ করিল না। বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত কর্ম্মে মনোযোগী থাকিল। মায়াসুন্দরীর আনন্দের সীমা নাই, কর্ত্তা অবসর লইয়াছেন, তাহার জন্য আর ভাবনা কি? দুঃখ অন্তে সুখ, সুখ অন্তে দুঃখ, পৃথিবীতে চিরনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, রমাকান্ত আজ যৎসামান্য উপায় করিতেছে, সময়ে তাহার আয়ের বৃদ্ধি হইবে, আবার পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই শ্রীকান্ত কতক উপায় করিয়া ভ্রাতাকে সাহায্য করিবে।

তিনি বহুকষ্টে পুত্রগুলিকে মানুষ করিতেছেন, লেখাপড়া শিখাইতেছেন, সময়ে সংসারের জন্য তাহারা আপনারাই ভাবিত হইবে, আজ তিনি যে ভার বহিতেছেন, সময়ে তাহারা সেই ভার স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিবে, তাহা হইলে তিনি মনের সুখে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করিবেন, ইহা ভাবিয়াই তিনি সুখে ও আনন্দিত মনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ব্রজেশ্বরের শয্যাশায়ী বৃদ্ধ পিতাকে আনা হইয়াছে, ব্রজেশ্বর নিজে রুগ্ন হইলেও সপরিবারে যথাবিধি চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিল, কিন্তু যাহার পরমায়ু শেষ হয় তাহাকে কিরূপে রক্ষা করিবেন, পিতার মুমূর্ষু অবস্থা বুঝিয়া সুবুদ্ধি ব্রজেশ্বর পিতার সদ্গতির জন্য তাঁহাকে তীরস্থ করিলেন। বৃদ্ধ হরিনাম শুনিতে শুনিতে অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে মগ্ন অবস্থায় চিরতরে মহাপ্রস্থান করিলেন। পুত্র কলত্র পৌত্র পৌত্রী সকলকে কাঁদাইয়া বৃদ্ধ কালধর্ম্ম পালন করিলেন। কাহার পক্ষে সময়ে ও কাহারও পক্ষে অসময়ে মৃত্যু বলিয়া বিবেচিত হইল। ব্রজেশ্বর যথাবিধি সৎকার করতঃ কায়ক্লেশে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আজ অমাবস্যা তিথি। ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশিতে কৃষ্ণলাল ভ্রাতার ব্যবহার ও নিজ অদৃষ্টের দুঃসহ কষ্টের বিষয় ভাবিয়া নিরাশ সাগরে ভাসিতেছে। কৃষ্ণলাল দেনার দায়ে বিব্রত হইয়া মনোদুঃখে কালক্ষেপ করিতেছিলেন, আহার বিহার সুখ সচ্ছন্দতা সকলই তাঁহার বিষবৎ বোধ হইতেছিল, যে কোন উপায়ে হউক ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন, ভ্রাতার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া নিরাশ মনে গৃহে আসিয়াছিলেন, অবলার অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া অগত্যা তাঁহাকে দেনা শোধ করিতে হইবে। পতিব্রতার অঙ্গের ভূষণ নষ্ট করিবেন না, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া তাহাই করিতে উদ্যত হইলেন? সদিচ্ছা কদাচ বিফল হয় না। কৃষ্ণলাল চিন্তা-সাগরে ভাসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে উদ্বিগ্নচিত্তে আর বহুকাল যাপন করিতে হইল না, জগৎ-চিন্তামণি তাঁহার প্রকৃত অভাব বুঝিয়া সস্নেহনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। পর দিবস প্রাতে কৃষ্ণলাল সজল নয়নে লোহার সিন্দুক খুলিয়া সরলার অলঙ্কারগুলি বাহির করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ বাক্সের তলদেশে এক খানি ক্ষুদ্রাকৃতি কাগজ খণ্ড দেখিতে পাইলেন।

পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে তিনি এই সিন্দুকটী পাইয়াছিলেন, বিশেষ আবশ্যক না হইলে সে সিন্দুক খোলাই হইত না, সরলার অলঙ্কারগুলি তাহাতেই সংরক্ষিত ছিল, কৃষ্ণলাল কাগজ খণ্ড হস্তে লইয়া মনে মনে বিস্মিত হইলেন এবং তদ্দণ্ডে খুলিয়া দেখিলেন যে, সে খানি সামান্য কাগজ নহে, এক খানি হাজার টাকার নোট। সিন্দুকের চাবি গৃহিণীর নিকটেই থাকিত, সরলা লেখাপড়া শিখেন নাই বটে, কিন্তু জিনিষ পত্রগুলি সিন্দুকে সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিতেন, অকস্মাৎ সিন্দুকে হাজার টাকার নোট দেখিয়া কৃষ্ণলালের হৃদয় উথলিত হইয়া উঠিল। শ্যামলালের গুণ অনেক, তিনি প্রমারা খেলিতে খেলিতে একদিন ধরা পড়িলে, কৃষ্ণলাল সেই দায় হইতে তাঁহাকে বিশেষ কৌশলে রক্ষা করেন, শ্যামলাল সেই উপলক্ষে ভ্রাতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এবং মধ্যে মধ্যে ঐরূপ দায় হইতে উদ্ধার করিবে এই আশায় কৃষ্ণলালকে একখানি হাজার টাকার নোট দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলাল সে খানি এক শত টাকার নোট মনে করিয়া বাক্সে রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই অবধি তাহার সে বিষয় স্মরণই ছিল না। কন্যার বিবাহ দিয়া দায়গ্রস্ত হইয়াছেন, সাধনা তাঁহার লক্ষ্মী মেয়ে, ভগবান এরূপ নিঃস্ব অবস্থায় তাঁহাকে যে লুপ্তধনের উদ্ধার করিয়াদিলেন, ইহাতে তিনি পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, যেখান হইতে যে অলঙ্কার খানি তুলিয়াছিলেন, একে একে সকলগুলি সেই স্থানে সাজাইয়া রাখিলেন, তিনি সুদে আসলে সর্ব্বসমেত সাতশত পঞ্চাশ টাকার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, কয়েক দিন চিন্তায় তাঁহার আহার নিদ্রা রহিত হইয়াছিল, সে ভাবনার কঠোর হস্ত হইতে আজ তিনি পরিত্রাণ পাইলেন। সরলার গহনাগুলি যে রক্ষা হইল,

ইহাতে তিনি সাতিশয় সুখী হইলেন; নোট খানি হস্তে লইয়া সিন্দুকটী বন্ধ করিয়া তিনি প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে সরলার নিকট উপস্থিত হইলেন, একে একে গৃহিণীকে সকল কথা জানাইলেন। এই ঘটনার দুই দিবস পূর্ব্বে সাধনা পিত্রালয়ে আসিয়াছিল, পিতার ভাবগতিক দেখিয়া সে যে তাঁহার অশান্তির কারণ হইয়াছে, তাহা সে সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু অবলা রমণী কি বলিয়া জন্মদাতাকে সান্ত্বনা করিবে, কেবল এক মনে এক প্রাণে ঈশ্বরের নিকট পিতার ঋণমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। আজ পিতা সম্মান বজায় রাখিবেন, লোকের নিকট তিনি অঋণী হইবেন, ইহাপেক্ষা সাধনার আর আনন্দ কি আছে? তাহাতে যে টাকায় পিতা দায় মুক্ত হইলেন, সে টাকার কিছুমাত্র আভাস তাঁহার জানা ছিল না, প্রকৃতপক্ষে এক্ষণে সে টাকা দৈব প্রদত্ত বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বিষণ্ণ কৃষ্ণলালের মুখে আজ হাসি দেখা দিল, তিনি আহারাদি করিয়া কর্ম্মস্থানে যাইবার সময়ে নোট খানি সঙ্গে লইয়া গেলেন, আসিবার সময়ে দেনাপত্র শোধ করিয়া আসিবেন বলিয়া গেলেন; শুনিয়া সাধনার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

যে সংসারে গৃহস্বামী ধর্ম্ম-পরায়ণ, গৃহিণী পতিপ্রাণা, পুত্রকন্যার পূজনীয় লোকের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, সে সংসার পদে পদে বিপন্ন হইলেও দরিদ্রতা বা অভাব জন্য লোক সমাজে অবমানিত হয় না। সত্যের অপলাপেই সংসারের অবনতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সংসারে নিত্যই ঘটিতেছে, অসদুপায়ে কেহ বা বহুল অর্থ উপায় করিয়া লোকের উপর প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, কিন্তু বালির বাঁধের ন্যায় তাহার সে

প্রতাপ লোপ পাইতে থাকে। ধর্ম্ম ভক্তিতে সংস্থাপিত সংসারে ঘাত প্রতিঘাত বশতঃ কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও তাহার অস্তিত্ব কোনপ্রকারে বিলুপ্ত হইবার নহে। কৃষ্ণলাল বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দিন কাটাইতেছেন, অসহায় অবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না কেন, তিনি কিন্তু দুঃসময়ে দাদাকে চিনিলেন। উপায়াক্ষম হইয়া দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন, তাহাতেও তিনি অন্যায় রূপে ধনশালী হইবার বাসনাকে কদাচ হৃদয় মধ্যে স্থান দেন নাই, ন্যায় পথে থাকিয়া সত্যের সমাদর করিয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতেই তাঁহার সুখে দিন কাটিয়া যায়। ঈশ্বর তাঁহাকে যে সকল পরিবারবর্গের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারাও তাঁহার মত সত্যের দাস, একমাত্র ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া কৃষ্ণলালের সকল বিঘ্ন কাটিয়া যাইতেছে, যাঁহার আদেশে তিনি বিষাদ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই অনুগ্রহে তিনি উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, ভগবান প্রিয় সন্তানের ভয় দূর করিয়াছেন, তাঁহার এতদিনের উদ্বেগ চিন্তা একেবারে বিদূরিত হইয়া গিয়াছে।

গৃহের নিত্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া সরলা সাধনাকে লইয়া বসিয়া আছেন, ছোট ছোট বালক বালিকা তাঁহাদের নিকটে বসিয়া আপন মনে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে সাধনা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! টাকা লইয়াই সংসার, যাহার অর্থ নাই, তাহার মত হতভাগা আর কে আছে? দেখিতে পাই এ সংসারে ধনেরই আদর, গুণের আদর কোথায়?"

সর। গুণ চিরস্থায়ী, তাহার লোপ নাই; টাকা কেবল এই সংসারের লীলাখেলার জন্যই, তাহা এইখানেই থাকিয়া যায়; তবে টাকা না হইলে সংসার চলে না।

সা। মা! টাকা না হইলে যদি সংসারই চলে না, তবে গরিব গৃহস্থের সংসারে আবশ্যক কি? টাকার জন্য তাহাদের আহার নিদ্রা সবই যায়।

সর। তুমি ছেলেমানুষ সংসারের ভালমন্দ কি বুঝিবে। ঈশ্বর দিন দিন, আর ২।১টী ছেলেপিলের মা হও, নিজের সংসার নিজে বুঝিয়া লও, তখন জানিবে যে সংসার কিরূপ ব্যাপার।

সা। মা! আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার অদৃষ্টে সে দিন না আসে. আমি সংসারের ভয়ানক ভবিষ্য ছবি দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইতেছি, ভোগের আর স্পৃহা নাই।

সর। মা! অমন কথা কি মুখে আনিতে আছে? আমরা যে শু মূৎ ঘাঁটিয়া মানুষ করিলাম, তাহার কি এই ফল হইবে?

সা। মা! জন্মিলেই ত মৃত্যু অবধারিত রহিয়াছে, তবে আগে আর পরে। যে দিন ডাক আসিবে সেদিন কেহই কাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

সর। সকলেই নিয়তির অধীন স্বীকার করি; কিন্তু যাহার সময় হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইলে, প্রাণ তত ব্যথিত হয় না। থা'ক ও সকল কথায় আবশ্যক নাই।

সা। মা! বাবার আমার সরল প্রকৃতি, সংসারের ভালমন্দ কিছুই চাহিয়া দেখেন না, আমার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে কখনও কাহারও প্রতি রাগ প্রকাশ করিতেও দেখি নাই, যে যাহা বলে, তাহাতেই তিনি সম্মতি দিয়া থাকেন, অথচ আয়ের অতিরিক্ত কখনও ব্যয় করেন না; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি তাঁহাকে এই সংসার লইয়া কত লাঞ্ছনা কত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে!

সর। মা! সংসারের এইত সুখ, যিনি পরের জন্য

আপনার দুঃখ কষ্টে কদাচ ভ্রূক্ষেপ নাই, সম্মুখীন বিপদরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রাণপণে কার্য্যসাধনে উদ্যোগী হন, তিনিই ত এ সংসারে ধন্য। পরিবারবর্গ প্রতিপালন, কন্যা-পুত্রের বিবাহ দেওয়া, লোক লৌকিকতা রক্ষা, এ সমস্তই ত গৃহস্বামীর কার্য্য। ভগবান যাঁহাকে কর্ত্তা করিয়াছেন, তাঁহাকে সকল ভারই বহন করিতে হয়, তুমি আমি মনে করি যে, তিনি বড় অসুখী; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তিনি যদি পোষ্যবর্গের যখন যাহা আবশ্যক দিতে অক্ষম হন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হয়; কিন্তু তাহা-দিগকে সুখী করিতে পারিলে তাঁহার মন আনন্দে ভাসে।

সা। মা! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি সব ঠিক বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না; আমার মনে হয়, এক জন অপরের জন্য কেন এত কষ্ট স্বীকার করে। পরমেশ্বর আমাকে যেমন সৃজন করিয়াছেন, অন্যেও সেইরূপ তাঁহারই সৃজিত; তবে একে কেন অপরের উপর নির্ভর করিবে।

সর। মা! এ কথা ত তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরস্পরে সাহায্য না করিলে, সংসার ত চলেই না। সংসারে একজন কর্ত্তা না থাকিলে, সংসার রক্ষা হয় না; দেখ তোমার জ্যেঠা মহাশয় অদৃষ্টগুণে বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, সমাজে তাঁহার যথেষ্ট মান সম্ভ্রম আছে; কিন্তু বড় দিদির প্রকৃতি তদনুযায়িক না হওয়ায় দিন দিন সোণার সংসার ছারখার হইতেছে। ঘনরাম ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানে না, স্বভাব-দোষে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয় না, আমোদ আহ্লাদে দিন কাটায়। বড়ঠাকুর পুত্রের গুণাগুণ সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন, সময়ে সময়ে যথেষ্ট শাসনও করেন; কিন্তু বাল্যকাল হইতে বড়দিদি তাহাকে আদরে

দিয়া এমনই খারাপ করিয়া তুলিয়াছেন যে, এখন সে আর গুরুজনের মান মর্য্যাদা রাখে না, আপন মনে যাহা ইচ্ছা করিয়া বেড়ায়। ছেলেকে কিরূপ শাসন করিতে হয়, দিদি তাহা জানেন না, তাই আজ ঘনরামের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

সা। বড় দাদা ছেলেবেলা থেকেই খারাপ হইয়াছে, আমার দাদার ত অমন স্বভাব চরিত্র নয়। কই দাদাকে তোমরা কখন শাসন করিয়াছ? যে যেমন কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে এখানে সেইরূপই থাকিতে হইবে।

মাতা ও কন্যার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে সুধারাম বিদ্যালয় হইতে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধারাম বিদ্যালয়ে জলখাবার খায় না, বাটীতে আসিয়াই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বৈঠকখানা-গৃহে পাঠে মনোযোগী হইল, মধ্যম ভ্রাতা সেবারাম ইতিপূর্ব্বেই বাটীতে আসিয়া আহারাদি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল, জ্যেষ্ঠ পড়িতে বসিয়াছে দেখিয়া অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া নিজ পাঠে মন দিল। বাটীর অন্যান্য বালক বালিকাগণ কেহ বৈঠকখানা-গৃহে, কেহ প্রাঙ্গনে আপন মনে খেলিতে লাগিল।

কৃষ্ণলাল কর্ম্মস্থানে যাইবার সময়েই বলিয়া গিয়াছিলেন যে, আজ তিনি সমস্ত দেনাপত্র চুকাইয়া বাটীতে আসিবেন। সাধনা পিতার কাপড় খানি, মুখ ধুইবার জল, গামছা প্রভৃতি সমস্তই গুছাইয়া রাখিয়া রন্ধনশালায় মাতার সাহায্য করিতে লাগিল। রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল, তখনও কৃষ্ণলালের দেখা নাই, না জানি তাঁহার কতই কষ্ট হইতেছে; সাধনা যতই মনে এই সকল চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার নয়নযুগল হইতে বারিধারা বর্ষিতে লাগিল, সরলা গৃহকার্য্য শেষ করিয়া

কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন; গৃহিণী, দুই পুত্র ও সাধনা কৃষ্ণলালের অপেক্ষায় তখনও আহার করেন নাই।

সা। মা! বাবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হইতেছে, আহা! আমাদের জন্য বাবা সারা হইলেন। ভগবান যাহাকে ধন দেন নাই, তাহাকে কতকগুলি কাচ্ছা বাচ্ছা দিয়া সংসার সাজাইয়া বড়ই গোলযোগে ফেলিয়াছেন। আমরা যদি না হই-তাম, তাহা হইলে বাবাকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না।

সরলা। মা! তোমাদের পাইয়াই আমরা সুখী, ধন লইয়া কি কেহ কখন সুখী হইতে পারে? লক্ষ্মী সদাই চঞ্চলা, কখন্ কাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, কাহার প্রতি বাম হন, সে কথা কে বলিতে পারে? টাকা লইয়া লোকে সুখী হয় না, অর্থে পদে পদে অনর্থ ঘটায়।

সা। না মা তা নয়, এ সংসার টাকার খেলা, যাহার টাকা আছে, তাহার লোক আছে, বল আছে। সম্পত্তি নাশের সঙ্গে সঙ্গেই সহায় লোপ হইয়া থাকে।

স। মা! এটা সংসারের নীতি, অর্থে সকলই লাভ হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু মনের সুখ একমাত্র গরিবেই ভোগ করিয়া থাকে।

সা। মা! তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে, যদি দুঃখীই প্রকৃত সুখের অধিকারী, তবে আমরা টাকার জন্য এত ভাবিতে থাকি কেন?

স। আমাদের ভাবনার বিশেষ কারণ আছে, আমরা লোকলৌকিকতা রক্ষা, আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণ প্রভৃতি সমস্তই নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটী আমাদের হইলে প্রাণে কষ্ট হয়, আমরা যতক্ষণ অভিলাষ পূরণ না হয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, যে কোন প্রকারে যাহাতে

সকল দিক রক্ষা হয়, লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে না হয়, তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়; তুমি যাহাদের কথা বলিতেছ, তাহারা এ সকল গ্রাহ্যই করে না, তাহাদের সমাজবন্ধন আমাদের অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট, এখনও ভোগ বিলাস তাহাদের গৃহে প্রবেশ করে নাই।

সা। মানুষ নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই দেখাইয়া দেয়,দেশ যতই সভ্য হইতেছে,বিলাস ভোগের উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

মাতা ও কন্যার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে কৃষ্ণলাল গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বৈঠকখানা গৃহে সুধা-রাম তখনও পড়িতেছিল, পিতার সাড়া পাইয়াই পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সেও উপস্থিত হইল। সাধনা পিতার জন্য বড়ই চিন্তিতা ছিল, তাহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিবার জন্যই সরলা এতক্ষণ কন্যার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। এক্ষণে পিতাকে দেখিয়া সাধনা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! আজ তুমি যাহা করিয়া আসিবে বলিয়া গিয়াছিলে, তাহা কি সব শেষ হইয়াছে? রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ মা, তোমাদের কল্যাণে সব শেষ করিয়া আসি-য়াছি। আজ আমি অঋণী হইয়াছি বলিয়া এতক্ষণ পরিশ্রম করিয়া কোথায় ক্লান্ত হইয়া পড়িব, না আমার শরীরে যেন নূতন বলের সঞ্চার হইয়াছে। যাহা হউক তোমরা দেখ্ছি এখনও খাওনি, যাও আর বিলম্ব কর্‌ো না।

সুধারাম ও সাধনা, মাতার সহিত একত্র আহারাদি করিয়া যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিল। কৃষ্ণলালের দুঃখের তিমির ঘুচিয়া আজ সুখ-আলোক বিকশিত হইল, তিনি অন্তর্দাহে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সে ভাব আর রহিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মানুষই মানুষের পরম শত্রু, আজ যাহার সহিত মনোল্লাসে আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতেছি, কাল সুযোগ বুঝিলে সেই আমার সর্ব্বনাশের উদ্যোগী হইবে। চিরদিন লোকের সমান যায় না, সচ্ছল অবস্থায় যাহারা আসিয়া বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়, বিশেষ আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, বন্ধুর কত হিত-চিন্তা করে, কিন্তু সে অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলেই, আর সে ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্যামলালের বৈঠকখানায় প্রতি সন্ধ্যায় যথেষ্ট লোক সমাগম ছিল, চাকর খানসামারা মুহুর্মুহু খাস-অম্বুরি সাজিয়া দিত, অন্দর মহল হইতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় রূপার ডিপায় পান আসিত, তাহা ছাড়া দুই এক দিন অন্তর প্রীতিভোজেরও অভাব ছিল না; কিন্তু সে সময় তাঁহার আর নাই। শ্যামলাল যাঁহাদিগকে প্রাণের বন্ধু ভাবিতেন, যাহাদিগের সহিত একদিন সাক্ষাৎ না হইলে, গুরুতর বিরহ অনুভব করিতেন, আজ তাহারাই তাঁহার অবস্থার বৈষম্য দেখিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে, পথে ঘাটে দেখা হইলেও তাহাদের সে পূর্ব্বভাব নাই, যদিও দুই একটী কথার উত্তর দেয় বটে; কিন্তু তাঁহার সহিত তাহাদের সদ্ভাব রাখা

অভিপ্রেত নহে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে শ্যামলালের যে ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা তিনি সম্যক বুঝিতে পারিয়াছেন; কোনরূপ প্রতিকার করিবার তাঁহার শক্তি নাই।

কৃষ্ণলাল যে দিন ঋণগ্রস্ত হইয়া ভ্রাতার নিকট সাহায্য প্রার্থনায় বৈমুখ হইয়াছিলেন, সে দিন তাঁহার ভ্রাতার প্রতি যথেষ্ট অশ্রদ্ধা হইয়াছিল বটে; কিন্তু কালস্রোতে তাঁহার সে ভাব এককালে ধৌত হইয়া গিয়াছিল, তিনি তজ্জন্য ভ্রাতার কোন অপরাধই গ্রহণ করেন নাই। এজন্য শ্যামলালের অবনতির সূত্রপাতেই তিনি সদা সর্ব্বদা ভ্রাতার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন; কিন্তু বিধাতা যখন যাহার ভাগ্য যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করেন, শত চেষ্টায়ও তাহার অন্যথা হয় না। শ্যামলাল কনিষ্ঠকে যথেষ্ট ভ্রাতৃপরায়ণ বলিয়া জানিতেন, বাল্যকাল হইতে উভয়ে একত্রে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বভাব চরিত্র, বিষয় কর্ম্ম, সকল বিষয়ই কৃষ্ণলালের সবিশেষ বিদিত থাকিলেও গ্রহ বৈগুণ্যে কনিষ্ঠের কথাবার্ত্তা তাঁহার তাদৃশ মনোমত হইত না। সহসা জ্যেষ্ঠের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াস কৃষ্ণলালের প্রাণ ভ্রাতার জন্য কাঁদিয়াছিল, তিনি ভ্রাতাকে সান্ত্বনা বাক্যে আর কিরূপে আশ্বস্ত করিতে পারেন, শ্যামলাল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিষাদ সাগরে ভাসিতেছেন, কৃষ্ণলাল মনে মনে ঠিক বুঝিতে পারিলেন যে, জ্যেষ্ঠকে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত ব্যথিত করা হইবে, প্রকৃত পক্ষে এরূপ করিয়া কিছুমাত্র উপকার দর্শিবে না, তবে এ সময়ে দেখা সাক্ষাৎ না করিলে হয়ত তাঁহার মনোকষ্ট বৃদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া তিনি এক দিবস অপরাহ্নে ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

শ্যামলালের যেদিন হইতে হীনাবস্থা হইয়াছে, সেই

দিন হইতেই তাঁহাকে একাকী থাকিতে হয়, তিনি অকস্মাৎ বহুল অর্থ নষ্টের কারণ মনোবেদনা পাইয়াছেন, তাহাতেই এককালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। এতাবৎকাল বহু পরিশ্রমে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা নূতন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া অক্ষক্রীড়ার হারের মত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। মনের কষ্ট মনেই সম্বরণ করিতেছেন, জনসমাজে তাঁহার কথা প্রকাশ হইলে সকলেই তাঁহার অবিবেচনার জন্য ধিক্কার দিবে, নিন্দা করিবে, একারণ তিনি উপস্থিত দুর্ঘটনার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৌশল! লোকে সুনাম জন্য কত কষ্ট ও কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে, দুর্নাম ঘোষণা হইতে কিন্তু বিলম্ব সহে না। তিনি কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিলেও লোক পরম্পরায় তাঁহার কথা লোক সমাজে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। তিনি যে সকল বন্ধুকে আপনার বলিয়া জানিতেন, সহোদর ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া যাহাদিগকে আপনার ভাবিতেন, যাহারা বহুকালাবধি তাঁহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণে দিনাতিপাত করিয়াছে, তাহারাই তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছে, লোক-পরম্পরায় এ কথাও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। এজন্য তিনি প্রায়ই অন্দর মহলে কালযাপন করিতেন, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বাটীর বাহিরে আসিতেন না। কৃষ্ণলাল ভ্রাতার সহিত দেখা করিতে গিয়া বৈঠকখানা গৃহেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্যামলালের ভৃত্য সমাচার লইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিল, কৃষ্ণলাল একাকী বসিয়া ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণলাল সাতিশয় উদার প্রকৃতি, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ এ

সংসারে কয়দিনের জন্য? দর্প, অহঙ্কার, বিষয়, বৈভব সকলই এ সংসারে থাকিয়া যায়। এ জগত নশ্বর জানিয়াও মানুষ যে আপনাকে প্রধান ভাবিয়া অন্যের উপর আধিপত্য করে, বুঝিয়া দেখিলে এ কেবল প্রগল্‌ভতা মাত্র। একমাত্র ধর্ম্ম আত্মার সহগামী, যে যেভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, পরিণামে তাহাকে তদনুযায়িক ফল ভোগ করিতে হয়, একমাত্র ধর্ম্মই পরলোকে সঙ্গের সাথী। কৃষ্ণলাল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্যামলাল বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে উভয়ের মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর, কৃষ্ণলাল ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দাদা! আপনার যে দুর্ঘটনার কথা শুনিলাম তাহা কি সত্য?

শ্যাম। ভাই! তুমি আমায় চিরকাল শ্রদ্ধা ভক্তি কর, আমার এ বিপদের সময় যে তুমি দেখা দিবে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি।

কৃ। দাদা! আপনি বুদ্ধিমান, বিবেচক হইয়াও, কি কারণে আপনার এমন হইল?

শ্যাম। ভাই! মানুষের কখন কি ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে? বিধাতা যখন যাহার অদৃষ্টে যেরূপ ঘটাইবেন, তাহাই হইবে। মানুষ অদৃষ্টাধীন, আমার বৃদ্ধ অবস্থায় ক্ষতির দশা ছিল, ঘটিয়াছে।

কৃষ্ণ। আপনি যাহা বলিতেছেন সকলই সত্য, মনুষ্যের চেষ্টা, অধ্যবসায়, যত্ন, কিছুতেই কিছু হয় না, তিনি যাহা করেন তাহাই হয়।

শ্যাম। কিন্তু ভাই, আমার দুঃখ এই যে, যে কাজে সময়ে দশ টাকা উপায় করিয়াছি, লোকের নিকট মান্য পাইয়াছি,

দশ-জনে সমাদর করিয়াছে, আজ সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম!

কৃষ্ণ। দাদা! মানুষের অদৃষ্ট যখন সুপ্রসন্ন থাকে, তখন যে কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করুক না কেন, বিশেষ লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী বাম হইলে কোন দিকেই সুবিধা হয় না। লোকের কথা যাহা বলিতেছেন, তাহার আর সারত্ব কি? নাম, মান্য এ সকলও ভাগ্য। যশোভাগ্য থাকিলে যশের কার্য্য আপনা হইতে আসিয়া পড়ে, একটুতেই লোকে বাহবা দেয়, গোঁড়ারও তখন অভাব থাকে না। আবার অসময় পড়িলে যাঁহারা এক সময় গড়িয়াছেন, তাঁহারাই ভাঙ্গেন। এই সংসারের ব্যাপার আমার জানিতে বাকি নাই।

শ্যাম। তুমি যাহা বলিতেছ, ঠিক কথা বটে, অলাভ কোন ব্যবসাতেই নাই, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া লাভ হইলে লোক সমাজে সুখ্যাতি ধরেনা, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, সকলেই নিন্দা করিয়া থাকে, অথচ ভাবিয়া দেখিলে লোকের ইহাতে ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই।

কৃষ্ণ। আপনিত আর অবিবেচক নহেন, লোকের কথায় বিচলিত হইবার আবশ্যক নাই। এখন মনে মনে কি স্থির করিয়াছেন?

শ্যাম। ভাবিয়াছিলাম পুনরায় ব্যবসায় নিযুক্ত হইব, লোকের গঞ্জনায় সে পথ রোধ হইয়াছে। যাহারা এক সময়ে আমাকে কত মান্য করিয়াছে, যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়াছে, আজ হয়ত তাহারা আর আমার প্রতি সে ভাব দেখাইবে না।

কৃষ্ণ। দাদা! দৈব দুর্ব্বিপাকে বিঘ্ন ঘটিয়াছে, ভগবান

আবার আপনার প্রতি সদয় হইতে পারেন। লোক আশ্রয় নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকে, আপনি এককালে হতাশ হইতেছেন কেন? যতদিন পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে হয়, একমাত্র আশার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া লোক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, আপনি একবারে হতাশ হইবেন না।

শ্যাম। কৃষ্ণলাল! তুমি যাহা বলিতেছ সকলই সত্য, কিন্তু এতকাল পরিশ্রম করিয়া, যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, এককালে সমূলে বিনাশ হইয়া গেল। এরূপ ভগ্নোৎসাহে পুনরায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে লাভ করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? ভগবান আমায় এই বৃদ্ধ বয়সে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় বা আমার কর্ম্মফলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। আমি বুঝিতেছি যে, আমি আর কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। এ জীবনে আমার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন অন্য কার্য্যে কিছুই হইবে না, আমার আশা ভরসা সকলই ঘুচিয়া গিয়াছে।

ভ্রাতাদ্বয়ে পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে ঘনরাম আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘনরাম পিতার উপস্থিত বিপদের কথা সমস্তই অবগত হইয়াছে, তথাচ তাহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। শ্যামলাল অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও পুত্রের শিক্ষার জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার কোনরূপ বিভিন্নতা করেন নাই। কিন্তু যাহার যেরূপ প্রকৃতি সে ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া বড়ই সুকঠিন। কৃষ্ণলাল, ঘনরামের স্বভাব চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, তথাচ ভ্রাতষ্পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজীউ! লেখা পড়া কেমন হইতেছে?

ঘন। যেমন হইতেছিল, তেমনই।

কৃ। লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ দিও, যেরূপ সময় দাঁড়াইতেছে, ইহাতে উচ্চ শিক্ষা না পাইলে পরিণামে বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে।

ঘ। লেখা পড়া টাকা উপায়ের জন্য নহে।

কৃ। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বটে; কিন্তু লেখা পড়া না জানিলে আজ কাল কোন কাজই হয় না। কোম্পানীর আফিসে চাকরী করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই পাসের খবর লয়।

ঘ। যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে।

কৃ। অদৃষ্টের অধীনই সকলে বটে, কিন্তু উদ্যোগ চেষ্টা না থাকিলে কোন কাজই হয় না। পিতা মাতা টাকা খরচ করিতেছেন, কিন্তু তোমরা না শিখিলে সকলই বৃথা। কেবল অর্থে লেখাপড়া হয় না। অর্থের দ্বারা যদি হইত তাহা হইলে বড়মানুষের গৃহে মূর্খ থাকিত না।

ঘ। তবে আপনি অনর্থক বাক্য ব্যয় করিতেছেন কেন?

ভ্রাতার সহিত পুত্রের যে সকল কথা হইতেছিল, শ্যামলাল নীরবে বসিয়া শুনিতে ছিলেন, এতক্ষণ কোন কথার উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনি ঘনরামের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না, ঘনরামের কথায় তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি সক্রোধে ঘনরামকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। ঘনরাম পিতার কথায় স্পষ্ট কোন উত্তর না দিলেও অস্ফুট-স্বরে ক্রোধ প্রকাশ ও অঙ্গভঙ্গি করিয়া তদ্দণ্ডে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। পুত্রের অবাধ্যতার জন্য শ্যামলাল তাহাকে আদৌ দেখিতে পারিতেন না, তবে তাঁহার অন্য কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় তিনি তাহার সকল দোষই উপেক্ষা করিতেন। গুরু-

তর অপরাধের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে সময়ে সময়ে তাহাকে তিরস্কার ও শাস্তি না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। গৃহ হইতে ঘনরাম প্রস্থান করিলে তিনি ভ্রাতার নিকট সংসার সম্বন্ধে হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটিত করতঃ কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সংসার সঙ্গিনী গৃহিণী, সেই সহধর্ম্মিণীর বুদ্ধিবৈগুণ্যে সোণার সংসার ছারখার হইতেছে, পুত্র অবাধ্য হইলে পিতার মন যেরূপ বিকৃত হইয়া থাকে, তাহার সম্পূর্ণ ভাব দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্ণলাল ভ্রাতার দুঃখের কথা শুনিয়া নয়ন জল আর সম্বরণ করিতে পারি-লেন না, দুই ভ্রাতায় কিয়ৎকাল দুঃখের কান্না কাঁদিলেন, পরে জ্যেষ্ঠকে প্রকৃতিস্থ করিয়া কৃষ্ণলাল বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রমাকান্ত এখন আফিসের কার্য্যে ও শিক্ষকতায় মাসিক ৪০।৫০ টাকা উপায় করিতেছে, তন্মধ্যে তাহার নিজের খরচে মাসিক দশ বার টাকা ব্যয় হয়; সংসারেরও কথঞ্চিৎ অভাব দূর হইয়াছে, একপ্রকার সুখসচ্ছন্দে দিন যাইতেছে। স্বামী দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসারে সাহায্য করিতেছেন, তাহাতে সাধনার আনন্দ ধরে না, যাহাতে শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ প্রভৃতি সকলে মনের সুখে থাকিতে পায়, যুবতীর তাহাই কামনা। গৃহস্থালীর যাবতীয় কারুকার্য্য একমাত্র সাধনাই করিত, তদ্ব্যতীত গৃহের অন্যান্য কার্য্যেও তাহার ঔদাস্য নাই, সে গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বয়োকনিষ্ঠদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনে কদাচ পরাঙ্মুখী নহে। ব্রজেশ্বর অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক বসিয়া আছেন; কিন্তু পরিমিত ভাবে যাহাতে সাংসারিক সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, পরিজনবর্গের স্বভাব চরিত্রের কোন বৈলক্ষণ্য না ঘটে, তৎপ্রতি তাঁহার সতত দৃষ্টি। শ্রীকান্ত এক্ষণে ইংরাজী বিদ্যা-লয়ে পাঠ করিতেছে, তৎকনিষ্ঠ বরদাকান্ত ও বিনয়কান্ত বঙ্গ-

বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছে। এখন ব্রজেশ্বর সংসার দায়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, রমাকান্তই সংসারের সমস্ত দেখে এবং ভ্রাতৃত্রয়ের লেখা পড়ার কারণ যাহা কিছু খরচ পত্র সমস্তই নির্ব্বাহ করিতেছে, সময়ে সময়ে হিসাব করিয়া দেখিলে রমাকান্তের মাসিক আয় অপেক্ষা ব্যয়ের তালিকা অধিক হইয়া উঠে। সাধনা আপনার খরচ পত্র কারণ সময়ে সময়ে মুখ ফুটিয়া স্বামীর নিকট হইতে দুই এক টাকা চাহিয়া লয়, কিন্তু নিজের দুই এক পয়সা ভিন্ন অধিক খরচ নাই, তবে যখন স্বামীকে ঋণজালে জড়িত হইয়া বিমর্ষ ভাবাপন্ন দেখিতে পায়, তখন তাহার প্রদত্ত অর্থ দিয়া তাহাকেই সাহায্য করে। রমাকান্ত স্ত্রীর কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়ে, এক একবার মনে ভাবে যে, তাহার যেরূপ খরচ পত্র হইয়া থাকে, যদি তাহার কিছু কিছু সাধনার হস্তে দেয়, তাহা- হইলে অসময়ে তাহার বিস্তর উপকার হইতে পারে; কিন্তু তাহার স্বভাব দোষে যুক্তি কার্য্যে পরিণত হয় না। সাধনাকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া ব্রজেশ্বর একদিনের জন্যও মনোকষ্ট পান নাই, পুত্রবধূ হইতে শ্বশুর মহাশয় যেরূপ সেবা শুশ্রূষার কামনা করেন, সাধনা হইতে তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। মায়াসুন্দরী বধূমাতাকে কন্যার মত স্নেহ যত্ন করিতেন, সাধনারও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির অভাব ছিল না। রমাকান্ত স্ত্রীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, সাধনার গুণে সকলেই মুগ্ধ, সকলকে সুখী করিয়া সাধনা মনোকষ্টে জীবন যাপন করিত। দরিদ্র পিতার কন্যা বলিয়া বাল্যকাল হইতেই সাধ আহ্লাদে তাহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না, তাহাতে যে শ্বশুরের পুত্রবধূ হইয়াছিলেন, তিনি সঙ্গতিশালী না হইলেও সাধনাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন। কলিকালের বধূ নানা-

কারণে আমোদ প্রমোদে বিলাসিনী হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রজেশ্বর বধূমাতার আচরণে একদিনের জন্য মনোক্ষুণ্ণ হন নাই। স্বামী রমাকান্ত সাতিশয় ক্রুদ্ধ প্রকৃতি ও অমিতব্যয়ী হইলেও সাধনা নিজগুণে একদিনের জন্যও স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা হন নাই। রমণীর স্বামীই সার, সাধনা পতিকে আয়ত্বাধীনে পাইয়াও তাঁহার সহিত যেরূপ আচার ব্যবহার করিত, তাহাতে রমাকান্ত স্ত্রীর গুণে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িত, তথাপি সাধনার কোন প্রকার বিলাস ভোগ স্পৃহা ব্যক্ত হইত না। পিতৃগৃহ হইতে ভ্রাতা বা দাসদাসী সাধনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সে তাহাদের সহিত এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিত যে, তাহারা প্রকৃতই সাধনা মনের সুখে শ্বশুর গৃহে কালক্ষেপ করিতেছে এরূপ বুঝিতে পারিত; কিন্তু সে যেরূপ মনোকষ্টে ছিল, তাহা তাহার আত্মীয় স্বজন অধিক কি সাধনার জীবন-সর্ব্বস্ব রমাকান্তও সময়ে সময়ে বুঝিতে পারিত না। লোকের সহিত কথাবার্ত্তায় আলাপ পরিচয়ে সাধনার বাচালতা ভাব আদৌ ছিল না, অথচ যাহার সহিত সে একদণ্ড কাল বাক্যালাপ করিত, সেই তাঁহার গুণে মোহিত হইত। সাধনা লজ্জাবশতঃ আহারাদির বিষয় মুখ ফুটিয়া একদিনের জন্যও উল্লেখ করে নাই, পিত্রালয়ে যাইয়া মাতার নিকটে দুই একটী মনোভাব ব্যক্ত করিত বটে, কিন্তু তাহাতেও সাধনা বিশেষ সতর্ক ভাবে কথা বার্ত্তা কহিত।

বাটীতে অনেকগুলি বালক বালিকা একত্র থাকিলে, পরস্পর বাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, বিচক্ষণ বিজ্ঞব্যক্তি দোষীর দোষের পরীক্ষা করিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত দ্বারা অভিযোগের মীমাংসা করেন, কিন্তু সকল সময়ে সকলের মস্তিষ্ক সমভাবে থাকে না,

গুরুজনের নিকট ন্যায্য বিচার হইবে ভাবিয়া দোষী ও নির্দ্দোষী উভয় পক্ষে উপস্থিত হয়, ভালবাসার বিচিত্র গতি! ভালবাসায় অন্ধ হইয়া সময়ে সময়ে সুবিজ্ঞ কর্ত্তৃপক্ষই দোষীকে নিরপরাধী প্রমাণ করিয়া থাকেন। সাধনার সহিত সকলেরই সদ্ভাব, সকলে তাহার গুণে মুগ্ধ হইলেও হাজার হউক পরের মেয়ে আবার অতি ভালমানুষ বলিয়া সে সময়ে সময়ে গুরুজনের চক্ষে বিনাদোষে অপরাধিনী হইয়া পড়িত, সাধনার মনোভাব ব্যক্ত করিবার এ সংসারে সকলে জাজ্বল্যমান থাকিলেও সে হৃদয়ের মর্ম্ম-কাহিনী আত্মীয় হইতে আত্মীয় প্রিয়জনের প্রিয়তম একমাত্র জগৎ-পতির গোচর করে, সরল প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগিলে অসহ্য হইয়া উঠে, বুদ্ধিমতী নিজগুণে সে সমস্ত লোকের নিকট অজ্ঞাত রাখিয়া নির্জ্জনে বিশ্বপতির নিকট হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিত, ইহাতে সরলার সরল প্রাণের সকল কষ্ট দূর হইয়া যাইত। কন্যা পুত্র, স্বামী দেবর, পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, ভাই ভগিনী, ননদিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের মঙ্গল কামনা সাধনা সতত ঈশ্বর সকাশে করিত।

শ্যামলালের উৎকট পীড়া, অন্তিম সময় উপস্থিত, সাধনাকে লইয়া যাইবার জন্য পিতৃগৃহ হইতে লোক আসিয়াছে, ব্রজেশ্বর বধূমাতাকে পিতৃগৃহে পাঠাইতে প্রায়ই স্বীকৃত হইতেন না, বিশেষ আবশ্যক না হইলে সাধনা তথায় যাইতে পাইত না, কিন্তু দুই দশ দিন থাকিয়াই তাহাকে পতিগৃহে আসিতে হইত। সাধনা শ্যামলালকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করিত, তাহাতে সে বাল্যকালে শ্যামলালের নিকট লালিতপালিত হইয়াছিল, লোক মুখে পিতৃব্যের অসুখের কথা শুনিয়া সাধনার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরের আদেশ ব্যতিত 'সাধনার পিতৃগৃহে যাইবার সাধ্য নাই, যে লোক তাহাকে লইতে আসিয়াছিল, সে ব্রজেশ্বরের নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল কথা উল্লেখ করিলেও তিনি বধূমাতাকে এ সময়ে পিতৃগৃহে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না, কহিলেন, যদি বৈবাহিক মহাশয়ের পীড়া একান্তই গুরুতর হয়, তাহা হইলে অবশ্য দুই চারি দিবস পরে তিনি সাধনাকে পাঠাইতে পারেন।

সাধনা শ্বশুরের নিষেধ বাক্য সমস্তই শুনিল, নিজ অভিমতে কোন কার্য্য করিবার তাহার শক্তি নাই, তবে হয়ত জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের সহিত এ জনমে আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি যে তাহার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, আর তাঁহার শেষ দশায় সেবা শুশ্রূষা করিয়া অভাগিনী মনঃতৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না, ইহাই সাধনার একমাত্র দুঃখ। লোক বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল, সাধনা মনে মনে কতই আক্ষেপ করিতে লাগিল, শ্বশুর শাশুড়ীর ভয়ে মনের উদ্বেগ মনেই সম্বরণ করিল। রমাকান্ত বাটীতে আসিয়া সকল সংবাদ অবগত হইল, সাধনা তাহাকে কোন কথা প্রকাশ না করিলেও সে তাহার মনোভাব কতক বুঝিতে পারিল। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, সহধর্ম্মিণীকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু পিতা যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণে তাঁহার সাধ্য নাই, সাধনার সরল প্রাণে ব্যথা দেওয়া হইয়াছে, যুবতী পতির পার্শ্বে শয়ন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল, রমাকান্ত তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইল। রমাকান্ত মনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া বিষণ্ণ ভাবে রাত্রি যাপন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সঙ্গদোষে স্বভাব নষ্ট, কথাটী চিরপ্রসিদ্ধ। ব্রজেশ্বর রমাকান্তের স্বভাব চরিত্রের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিতে না পাইলেও তাহাকে সদা সর্ব্বদা সাবধান করিতেন, রমাকান্তও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন বটে; কিন্তু আপনাকে সমধিক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ জানিয়া তৎপ্রতি বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিতেন না। ব্রজেশ্বর পুত্রের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে কোন অংশে ত্রুটী করেন নাই, ব্রজেশ্বরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রমাকান্ত যতই ইতর প্রকৃতির লোকের সংস্রবে মিলিত হউক না কেন, তাহার বাল্যকাল হইতে যেরূপ স্বভাব চরিত্র দাঁড়াইয়াছে, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। প্রকৃত পক্ষে রমাকান্ত সভ্য অসভ্য, ইতর ভদ্র নানাবিধ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিত। এক দিবস রমাকান্ত সন্ধ্যার পর আহারাদির উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ললিত আসিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রমাকান্তের প্রতিবেশী, সম্প্রতি তাহাদের পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছে, ইতিপূর্ব্বে পল্লীগ্রামে তাহাদের বাস ছিল, ললিতের স্বভাব চরিত্র মন্দ, তাহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যেন অসৎ প্রকৃতির লক্ষণ তাহার বদন মণ্ডলে স্পষ্টরূপ ব্যক্ত রহিয়াছে, যদিও চারি পাঁচ বৎসর মাত্র ললিত রমাকান্তের প্রতিবেশী হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভাব ভক্তি চলন চালন পল্লীস্থ সকলেই অবগত হইয়াছে। ললিতমোহন দেখিতে বেশ ফিট ফাট, ভদ্রসন্তান, লোকের দায়ে বুক দিয়া পড়ে; কিন্তু সে একে বিলাসভোগী, তাহাতে মদিরাশক্ত ও সাতিসয় ইন্দ্রিয়ের দাস হওয়ায় দিনে দিনে সমাজে তাহার প্রতিপত্তির খর্ব্ব হইয়াছে, লোকে তাহার সহিত আলাপ পরিচয় রাখে বটে, কিন্তু সে কেবল তাহাদের স্বার্থের জন্য, ললিত মদ্যপায়ী হইলেও তাহার প্রকৃতি তাদৃশ নীচ ভাবাপন্ন নহে, যাহার প্রতি সকলের বিবদৃষ্টি, সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সজ্জন হইলেও লোকের নয়ন শূল হইয়া উঠে; কেহ তাহার সহিত আলাপ পরিচয় রাখিতেও ইচ্ছা করে না। ললিতমোহন যেখানে লোকের আমোদ প্রমোদ দেখিতে পায়, সেইখানেই মিশিয়া পড়ে, কিন্তু এ ভাবে তাহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় না; নিজের স্বভাব দোষে নিন্দিত হইয়া স্বল্পদিনের মধ্যেই সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ব্রজেশ্বর ললিতমোহনকে বিশেষরূপে চিনিতেন, ইতিপূর্ব্বে রমাকান্ত যে ললিতের সহিত একত্র আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন, এ সংবাদের বিন্দু বিসর্গও তিনি জানিতে পারেন নাই। ললিতকে আজ রমাকান্তের অপেক্ষায় পথিমধ্যে দাঁড়াইতে দেখিয়া ব্রজেশ্বরের ক্রোধাগ্নি এক কালে প্রজ্বলিত হইল, ললিতকে কোন কথা কহিবার তাঁহার সাধ্য নাই, কিন্তু রমাকান্ত তাঁহার ঔরসজাত পুত্র, তিনি রমাকান্তকে অবিলম্বে তৎসমীপে উপস্থিত হইবার জন্য ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

রমাকান্ত পিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, সঙ্গদোষে ভাল মন্দ নানাস্থানে যাতায়াত থাকিলেও পিতার আজ্ঞা রমাকান্ত কদাচ অন্যথা করে না। এদিকে ললিতমোহন পার্টিতে যোগদান কারণ তাহার জন্য পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে, ওদিকে পিতা তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন, সে কোন্ পক্ষ বজায় রাখিয়া কার্য্য করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না, যাহা হউক কোন প্রকার ওজর আপত্তি ব্যতিরেকে সে পিতার সহিত সাক্ষাৎ কারণ অগ্রসর হইল। ব্রজেশ্বর সাতিশয় রাগান্বিত হইয়া রমাকান্তকে ডাকাইয়া ছিলেন, পুত্র সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল রমাকান্ত! তুমি যাহা করিতেছ কর, আমার নিষেধ নাই; কিন্তু চিরদিন এরূপ যাইবে না, স্মরণ রাখিও, তুমি যাহা কর, মনে ভাব কেহই জানিতে পারে না, সেটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল।" পিতার কথায় পুত্র অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, কোন প্রত্যুত্তর করিতে তাহার সাধ্য হইল না, নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। ব্রজেশ্বর পুত্রের বিষয়ে সন্দিগ্ধ চিত্ত ছিলেন না, তিনি ললিতমোহনকে পুত্রের অনুসন্ধানে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া তাহাকে এই কয়েকটী কথা শুনাইয়া ছিলেন; কিন্তু রমাকান্ত তাহাতে মর্ম্মাহত হইল। এতাবৎকাল ব্রজেশ্বর তাহাকে অন্যান্য বিষয় সূত্রে যথেষ্ট ভৎর্সনা ও তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল কারণে তাহার তাদৃশ মন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রমাকান্ত যাহা যাহা করিয়া বেড়ায়, যে যে স্থানে তাহার যাতায়াত আছে, যাহারা তাহার সহিত একত্রে কালাতিপাত করে, হয়ত সবিশেষ সংবাদ পিতৃদেব অবগত হইয়াছেন, নতুবা কি জন্য তিনি তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার

করিলেন, সে এই চিন্তাতেই এককালে বিহ্বল হইয়া পড়িল। প্রাণের বন্ধু ললিত মোহন ঘোরতর আমোদের জন্য তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উভয়ে সন্ধ্যাকালে দেখা সাক্ষাতের পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল কিন্তু সহসা পিতার কয়েকটী কথায় রমাকান্ত এককালে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল, উৎসাহ উদ্যম চেষ্টা সকলই যেন তাহার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল। সে পিতার সম্মুখে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। অবিলম্বে তথা হইতে আসিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল। ললিতমোহন রমাকান্তের আশায় বহুক্ষণ পথে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্থানান্তরিত হইল। পিতা পুত্রে কথান্তর হইতেছে, এ সংবাদ ললিত-মোহন পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারিয়াছিল, একারণ রমাকান্তকে পুনরায় ডাকিতে তাহার সাহস হয় নাই। রমাকান্ত পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া এরূপ মনোক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া এককালে শয্যায় শায়িত হইল।

রমাকান্তের এখন চরিত্র দোষ দাঁড়াইয়াছে, একে সহরের প্রলোভন, তাহাতে থিয়েটারে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ললিত ও রমাকান্ত অভিন্ন হৃদয় বলিলে হয়, এজন্য রমাকান্ত স্থির থাকিতে পারিল না, সন্ধ্যার পর গোপনে বাটীর বাহির হইয়া যথায় ঘোরতর রসরঙ্গে প্রাণের বন্ধু ললিত উন্মত্ত, তথায় গিয়া তাহাদের সহিত আমোদে যোগ দিল। ললিত বন্ধ বটে, তাহার সহিত মিশিয়া ও নানা প্রলোভনে পড়িয়া রমাকান্তের এখন অতিশয় কলুষিত চরিত্র দাঁড়াইয়াছে। ললিত রমাকান্তকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত; কিন্তু কুলটার চক্রে পড়িয়া সে এখন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়াছে,

তাই তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইল। ললিত বার-বিলাসিনীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রমাকান্তের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। ললিতের পরামর্শে ও বারাঙ্গনাদের চক্রে পড়িয়া রমাকান্তের সে রাত্রি বাটী আসা দায় হইল। ললিত ভাবিল, আমিত মজিয়াছি এখন এটাকে কলে কৌশলে মজাইতে হইবে, পাপে মগ্ন হইলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। রমাকান্ত পিতার সুপুত্র, সাধনার অবলম্বন, তাহাতে রমাকান্ত অর্থ সম্বন্ধে বড় কৃপণ, তাহারা কৌশল করিলেও তাহার সে সকল কৌশল বুঝিতে বিলম্ব লইল না, সে নানা ছলে সে দিন বাটী ফিরিল।

রমাকান্ত বাটী আসিয়া ভাবিল, ললিতটা একেবারে গেছে, তাহার কোন নেশা বাকি নাই, তদ্ব্যতীত তাহার ভাবগতিকও ভাল নয়; ললিতের সহিত আর মিশিব না; কিন্তু ভবিতব্যের লেখা কে খণ্ডন করিতে পারে? তৎপরদিন রমাকান্ত রাস্তায় যাইতেছে এমন সময়ে একখানি গাড়ি আসিয়া তাহার সম্মুখে থামিল, গাড়ির ভিতর হইতে সুকোমল হস্ত প্রসারিত হইয়া তাহাকে একখানি পত্র দিল, পত্রপাঠ রমাকান্ত প্রথমে চমকিত হইল, পলাইবার চেষ্টা করিল,পরে কি ভাবিয়া তাহাদের গাড়িতে উঠিল। ভাবিল, না উঠিলে হয়ত ইহারা বাটীতে গিয়া কেলে-ঙ্কারি করিবে। রমাকান্ত সে দিন যে বারবিলাসিনীর বাটীতে গিয়া ললিতের সহিত আমোদে যোগ দিয়া-ছিল, গাড়ি সেই বাটীর সম্মুখে গিয়া থামিল। পরে রমাকান্ত সে দিন যে গৃহে বসিয়াছিল, আজিও সেই গৃহে উপবিষ্ট হইয়া দেখিল যুবতী পীড়িতা, এবং তাহাকে দেখিবা মাত্র মূর্চ্ছিতা হইল, অনেক শুশ্রূষায় মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, ললিত ঔষধ ও ডাক্তার আনিল, আবার মূর্চ্ছা! মধ্যে মধ্যে কেবল পাগলিনীর

ন্যায় রমাকান্তের নাম করিতেছে, সকলেই রমাকান্তকে সে রাত্রি রমণীর শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত থাকিতে অনুরোধ করিল। দশচক্রে পড়িয়া রমাকান্ত কিছুই ভাবগতিক বুঝিতে পারিল না, অর্থ ব্যয় নাই, কেবল শুশ্রূষা করায় দোষ কি ভাবিয়া রমাকান্ত সে রাত্রি তথায় যাপন করিল। মানুষের মন স্তুতিবাক্যে ও প্রলোভনে ভুলে, বিশেষতঃ মায়াবিনীদিগের কলকৌশল বুঝে কার সাধ্য? তাই রমাকান্ত মজিল। পরদিন সে বাটী গেল, কিন্তু তাহার মন প্রাণ এখানে পড়িয়া রহিল, ললিতের মত সে একেবারে উন্মত্ত না হউক, তাহার মনরাজ্যে সেই কামিনী অধিকার স্থাপন করিল। রমাকান্ত ললিতের মাথায় হাত বুলাইয়া বিলাস সুখ ও আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিতে লাগিল, কিন্তু এ কার্য্যে চিরকাল পরের মাথায় হাত বুলান চলে না; শেষে রমাকান্তের নিজ পকেট হইতেই খরচ হইতে লাগিল। ললিতের সম্পত্তি যাহা ছিল, দুই তিন বার হাণ্ডনোট কাটাতেই সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখন বরং ললিত রমাকান্তের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

একদা রমাকান্ত বাটীতে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় ব্রজেশ্বরের সম্মুখে পড়ায় রমাকান্তকে ব্রজেশ্বর বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন। বাটীতে প্রবেশ করিয়াই পিতার সম্মুখে পড়াতে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইয়া রমাকান্ত বিগত ঘটনাবলী যতই নির্জ্জনে মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিল, উত্তরোত্তর তাহার চিত্ত ততই ব্যথিত হইতে লাগিল, সে ভাবিল, আমি যাহা করিতেছি বা করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে সকল বিষয়ে আমিই সম্পূর্ণ দোষী। আমি গুরুজনের নিকট অপ্রকাশ রাখিয়া কত শত কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ

মনে ভাবিয়াছি বড় ফাকি দিলাম, কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি যে, সে ফাঁকি দেওয়া নহে ফাঁকি পড়া। ঈশ্বরের কি চমৎকার নিয়ম, নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেই কষ্ট পাইতে হয়। কেন আমি অসৎসঙ্গের বশবর্ত্তী হইলাম? কে আমাকে এরূপ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত করিল? উঃ সঙ্গদোষের কি ভীষণ পরিণাম! না, আমি নিজের চরিত্র নিজেই নষ্ট করিয়াছি, ইহাতে অন্যের অপরাধ কি? ধিক্ আমার জীবনে ধিক্! মানুষ বলিয়া লোক সমাজে পরিচয় দিবার, লোকের নিকট মুখ দেখাইবার আমার আর কি আছে? মান, মর্য্যাদা, যশ, গৌরব, প্রতিপত্তি সকলই একমাত্র চরিত্রের উপর নির্ভর করে, যখন আমি সেই দিব্য বস্তুর অনাদর করিতে বসিয়াছি, তখন আমাতে ও পশুতে প্রভেদ কি? কেন আমি এমন হইলাম, কে আমায় এ পাপ সরোবরে নিমগ্ন করিল! ছি ছি! আমি নিজে অপরাধী হইয়া আবার পরের উপর দোষারোপ করিতেছি কেন? চরিত্র হীন হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না, ভাল মন্দের বিচার করিবার শক্তি লোপ পাইয়া যায়, নতুবা আমি সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়া পরের উপর দোষ চাপাইতে উদ্যোগী হইব কেন? আমার স্বভাবের দোষ, আমি কি ছিলাম, কি হইলাম? বাবা আমাকে বড় ভালবাসেন, কিন্তু তিনি জানিয়া শুনিয়া আমার প্রতি কেন এ উপেক্ষা করিতেছিলেন? না না তিনিত ঠিক কাজই করিয়াছেন, আমাকে অহোরাত্র নিয়মমত কার্য্য করিবার জন্য সতর্ক করিয়াছেন, আমি তাহার অবৈধ আচরণ করিয়াই বিপথগামী হইয়াছি, তাই আমাকে এ মনোকষ্ট পাইতে হইয়াছে, আমার দিন দিন যে অধোগতি হইতেছে। যত

দিন যাইতেছে, উত্তরোত্তর পাপপথে নিমগ্ন হইতেছি, জ্ঞান থাকিতে জ্ঞান হারাইতেছি, ভাল এ ভাবের কি পরিবর্ত্তন হয় না? আমি কি ছিলাম কি হইলাম, লোকে আমার চরিত্র আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিত, আজ আমার সে নাম কোথায়? জন সমাজে অপবাদ রাষ্ট্র হইবার আর বিলম্ব কি? মানুষ হইয়া পশুতে পরিণত হইতেছি। ভগবান এ ভাবের কি পরিবর্ত্তন করিবেন! কতদিনে ঈশ্বর আমাকে সুমতি দিবেন? হায়! কবে আমি আবার লোকের নিকট মুখ দেখাইব! আমি ইচ্ছায় সমস্ত নষ্ট করিয়াছি, কই ইচ্ছা করিলে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি না ত! আমার হৃদয় ভাব কত দুর্ব্বল দাড়াইয়াছে, আমি আপনাকে আপনিই ধিক্কার দিতেছি। যদি পরিণামে আমার এইরূপ শোচনীয় দশা দাড়াইল, তাহা হইলে আমার অস্তিত্বে আর প্রয়োজন কি? কেন আমি এরূপ কুপথগামী হইলাম? আমার কি অভাব ছিল? ভাবিয়া দেখিলে সংসারের আমোদ প্রমোদ কোন বিষয়েই আমি বঞ্চিত ছিলাম না, সে সকল সার বস্তু তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অসার বস্তু লইয়া আমোদে মাতিলাম কেন? সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বস্ব ধন চরিত্র একরূপ নষ্ট হইয়াছে। এখন উপায় কি? কেবল মাত্র কুনাম রটিয়াছে এমত নহে, আদরের বস্তুর অনাদর করিয়া হেয় সামগ্রীকে উপাদেয় ভাবে গ্রহণ করিয়াছি। রমাকান্ত এইরূপে নির্জ্জনে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিলাপ করিতেছে, এমন সময়ে সাধনা আসিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। যুবতী গৃহমধ্যে আসিয়া অর্গল বদ্ধ করিয়া পতির সম্মুখীন হইবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, রমাকান্ত এখন প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, সে ক্ষণকাল পতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শয্যায় শায়িত হইল। সাধ্বী

নাকে শয্যা পার্শ্বে দেখিয়া রমাকান্তের প্রাণ আরো বিষাদে পূর্ণ হইল, তাহার একান্ত ইচ্ছা, সহধর্ম্মিণীর নিকট অদ্যকার ঘটনা একবারে গোপন রাখিবে; কিন্তু তাহার হাবভাবে কিছুই অপ্রকাশ রাখিতে পারিল না। সাধনা বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে পতির লজ্জা ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সুমধুর বচনে কহিল, দেখ যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন হইতে সাবধান হইবার চেষ্টা কর. ভাল মন্দ সমস্তই নিজের হাতে, নিজে ঠিক থাকিলে বিপথগামী করিতে কে পারে? তুমি এত বিলাপ করিতেছ কেন, অনুতাপে ফল কি? মন স্থির কর মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, আমার গায়ে হাত দিয়া শপথ কর যে, যাহাতে নিজের অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, কখন সে কাজে প্রবৃত্ত হইবে না। আমি অবলা, তুমি জ্ঞানবান সদ্বিবেচক, আমি তোমাকে এ বিষয়ে আর কি বুঝাইব? যখন তখন তোমার গতি ভিন্নরূপ দেখিতেছি; কিন্তু তুমিত সাবধান হইতে পারিতেছ না। আজ তোমার মনে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, কাল সঙ্গীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আর সে ভাবও থাকিবে না, আবার তুমি অসার আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত হইয়া পিতার গঞ্জনাভাগী হইবে। জানিয়া শুনিয়া তুমি তোমার অনিষ্ট করিতেছ, পুত্রের অনিষ্ট বা কলঙ্কের কথা শুনিলে পিতার প্রাণ তাহার প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না? বাবার উপর তোমার বিরক্ত হইবার কোনই কারণ নাই, তুমি অবশ্য নিজ অপরাধে অপরাধী হইয়াছ, তাই অন্তর্দাহে জ্বলিতেছ। অদ্যকার ঘটনা স্মরণ রাখিলে ভবিষ্যতে কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাতে নিজের অবনতি,

স্থির জানিও তাহাতেই লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয়, আজ স্নেহময় পিতা তোমার মুখের প্রতি চাহিয়া মঙ্গল কামনায় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, যদি এখন হইতে সাবধান হইতে সযত্ন না হও, সময়ে লোক তোমার কার্য্য দেখিয়া উপহাস ও অবজ্ঞা করিবে, ভাবিয়া দেখ তাহাতে তোমার সুনাম কোথায় থাকিবে, তুমি মনুষ্যত্ব হারাইবে; সে সময়ে তোমার প্রাণ কতই ব্যথিত হইবে। সাধনা এইরূপ ভাবে পতিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। রমাকান্ত বুঝিল যে, সাধ্বী-সতী সাধনার উপদেশ বাক্যগুলি অসার নহে, প্রকৃতপক্ষে এইভাবে কার্য্য করিলে বিশেষ উপকার দর্শাইতে পারে। সে সাধনাকে সাদরে আলিঙ্গন করিল, রমাকান্তের ম্লানভাব আনন্দে পরিণত হইল, স্ত্রীর যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে কৃত সঙ্কল্প হইল, সে সেই দিন হইতে ললিতের সঙ্গ ত্যাগ করিল। সঙ্গীগণ নান ছলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেও সে আর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল না।
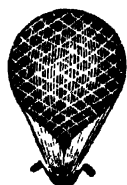
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বরের বৈমাত্র ভ্রাতা তারকেশ্বর এবং বিধবা ভগ্নী মাধবী তাঁহার গলগ্রহ হইয়াছে। সময়ে তিনি তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার অবস্থা মন্দ হইয়াছে, তথাচ কর্ত্তব্য বোধে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার তিনিই সম্পন্ন করিতেছেন। তারকেশ্বর মদ্যপান ও বেশ্যাগমনই জীবনের সার বুঝিযাছে, শিক্ষিত না হইলেও মনে করিলে যৎসামান্য উপার্জ্জনে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। যতদিন তাহার স্ত্রী জীবিত ছিল, ব্রজেশ্বর স্বয়ং তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; কিন্তু তারকেশ্বর সহধর্ম্মিণীর অবর্ত্তমানে তাহার একমাত্র পুত্রকে ভ্রাতার অজ্ঞাতসারে স্থানান্তরে পোষ্য পুত্র দেওয়ায় ব্রজেশ্বর কনিষ্ঠের মুখাবলোকন করিতেন না। বহুদিবসাবধি তারকেশ্বরও ভ্রাতার কোন সংবাদ লয় নাই, আমোদ প্রমোদেই কালক্ষেপ করিয়াছিল; যখন বুঝিল, এ ভাবে কাল যাপনে কষ্ট ব্যতীত সুখ নাই, অথচ যাহাদের সহিত একত্র কাল কাটাইত, তাহারা আর তাহার প্রতি সদয় নহে, তখন নিরুপায় হইয়া ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইল, ব্রজেশ্বরের তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া-

ছিল, অধিকন্তু বংশধরকে অন্য গোত্রে পোষ্যপুত্র প্রদান করায় তিনি কনিষ্ঠের প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উপায়াক্ষম ভ্রাতা তাঁহার শরণাগত হওয়ায় তিনি তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

ব্রজেশ্বরকে অবস্থাপন্ন বুঝিয়া একে একে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার আশ্রয়াধীন হইয়াছিলেন, সময়ে তিনি উপায়াক্ষম ও সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় করিয়া দুর্দ্দশাপন্ন হইলে, পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে কথঞ্চিৎ কাতর হইয়া পড়েন। পুত্র রমাকান্তের তাদৃশ আয় নাই যে, তাহাতে উপপোষ্য-গণের প্রতিপালন হয়। এরূপ অবস্থায় রমাকান্ত পিতার বৈমাত্র ভ্রাতা ও ভগিনীর ভরণ পোষণ ভার গ্রহণে একান্ত অপারক। তাঁহার যে ভগিনী এক্ষণে পোষ্যভাবে রহিয়াছে, তিনি গৃহিণীর তত্ত্বাবধারণে থাকিয়া কথঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া একখানি শীতবস্ত্র ক্রয় কারণ তাঁহারই নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, ব্রজেশ্বর ভাবিয়াছিলেন যে, গৃহিণী অবশ্যই স্বামীকে শীতবস্ত্র ক্রয় কারণ অনুরোধ করিবেন; কিন্তু ভগিনী তাহা না করিয়া টাকা গুলি স্বয়ং খরচ করিয়াছিলেন। কথায় কথায় বহু দিবস পরে ভগ্নীর চরিত্র অবগত হইলেন। গচ্ছিত টাকা লইয়া খরচ করিলেন, আবার শীতবস্ত্রও ব্রজেশ্বরের নিকট হইতে লইলেন, ব্রজেশ্বর ভগ্নী কর্ত্তৃক ঈদৃশ বঞ্চিত হইয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন।

বৈমাত্র ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়েই ব্রজেশ্বরের সহিত সদ্ভাব রাখে নাই, পদে পদে তিনি তাহাদের উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহারা সাংসারিক অভাব বা কাজ কর্ম্মের প্রতি আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মাত্র আমোদ করিবে, ইহা রমাকান্ত ও তাঁহার মাতার প্রাণে অসহ্য হইয়া

উঠিল। ব্রজেশ্বর স্বয়ং কোন ব্যবস্থা না করিলে তাহারা তাঁহার বিনানুমতিতে কি করিতে পারেন? ব্রজেশ্বর বিচক্ষণ ব্যক্তি, স্ত্রী ও পুত্র যে উপপোষ্য দ্বয়কে বিদায় করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না; কিন্তু তাঁহার কি শারীরিক কি মানসিক কোন পক্ষেই সামর্থ্য নাই, এরূপ অবস্থায় তিনি নিজেই তাহাদের গলগ্রহ রহিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদের কি উপায় করিতে পারেন? সময়ে ব্রজেশ্বরের মনে বিষম গোলযোগ উঠিল, কথাসূত্রে তিনি একদিবস গৃহিণীকে অকারণ তিরস্কার করিলেন, মায়াসুন্দরী দশজনকে প্রতিপালন করিতে কদাচ কাতরা নহেন, তিনি নিজের মুখের অন্ন ক্ষুধার্ত্তকে অম্লান বদনে দিয়া স্বয়ং উপবাসী থাকিতে পারেন; কিন্তু দেবর ও ননদের ব্যবহারে তিনি সাতিশয় মর্ম্ম পীড়িতা হইয়াছিলেন। বিনাদোষে স্বামী কর্ত্তৃক এরূপ তিরস্কৃতা হইয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সংসার সম্বন্ধে আর কিছুই দেখিবেন না। ব্রজেশ্বর বুঝিলেন যে, তাঁহার দোষেই সংসারের এ অশান্তির সঞ্চার হইয়াছে, তিনি সকলের কার্য্যাকার্য্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন। স্বল্প দিনেই জানিতে পারিলেন যে, উপপোষ্য দ্বয় দ্বারা সংসারের বিবিধ প্রকারে অনিষ্ট হইতেছে। একে তাঁহার কোপন স্বভাব, তাহাতে স্বচক্ষে তাহাদের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তিনি এককালে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। উপযুক্ত ভ্রাতা মাদক দ্রব্য সেবনে দিবারাত্রি যাপন করে, অথচ যাহাতে সংসারের কোন উপকার হইতে পারে, এরূপ কার্য্যে তাহার দৃষ্টি নাই, বিধবা ভগ্নীর অন্য কেহ আত্মীয় স্বজন নাই, যত দিন সে জীবিতা থাকিবে, ততদিন ব্রজেশ্বরই তাহার আশ্রয়, এ জন্য তিনি ভগ্নীর প্রতি কোন প্রকার রাগ প্রকাশ

করিলেন না। কিন্তু ভ্রাতাকে তিরস্কার করায় ভগ্নীর প্রাণে ব্যথা লাগিল, উভয়ে পরামর্শ করিয়া পরদিবস ব্রজেশ্বরের বাটী হইতে স্থানান্তরিত হইল, ব্রজেশ্বর তাহাদের প্রকৃতি বুঝিয়া কোন কথাই কহিলেন না।

শ্রীকান্ত ও তাহার অন্য দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতেছে। ভ্রাতৃত্রয় রমাকান্তের বিশেষ অনুরক্ত ও আজ্ঞাধীন, তাহারা পিতাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে, জ্যেষ্ঠের প্রতিও তাহার কোন অংশের ত্রুটি করে না। এক দিবস রমাকান্ত মাতার নিকট কথায় কথায় তাহার ঋণের কথা বলিল; তিনি স্ত্রীলোক, তথাপি রমাকান্তকে প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, "বাবা! তোমার অবস্থা কি আমি জানিতে পারিতেছি না, হায়! কতদিনে যে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন, তোমার ভাল চাকরী হইবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই! শ্রীকান্ত ভালরূপ লেখা পড়া শিখিয়া দশটাকা উপায়ক্ষম হইলে তোমার ও আমার উভয়েরই উপকার হইবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবে? যাহা না করিলে নয়, তাহা করিতেই হইবে। দেখি, যদি কোন দিকে সুবিধা হইয়া উঠে।" মাতার উত্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বেই রমাকান্ত স্থির জানিয়াছিল যে, তাঁহার দ্বারা কোন উপকারই হইবে না, তবে অর্থাভাবে প্রপীড়িত হইয়া তিনি মায়াসুন্দরীর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এরূপ কথায় মাতার প্রাণে ব্যথা দেওয়া হইল, মাত্র ভাবিয়া রমাকান্ত কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। মায়াসুন্দরীর সহিত রমাকান্তের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ব্রজেশ্বর পরে সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে রমাকান্তের ইহাতে কোনই অপরাধ ছিল না; কিন্তু ব্রজেশ্বর,

ইহাতে যথেচ্ছভাবে তাহাকে তিরস্কার করিলেন, রমাকান্ত অকারণ পিতার ঈদৃশ কঠোর ব্যবহারে সাতিশয় মনোক্ষুন্ন হইল, কিন্তু তাঁহাকে কোন প্রত্যুত্তর করিল না।

কর্ত্তার দোষগুণেই সংসার নষ্ট বা রক্ষা হয়। মায়াসুন্দরী অনেক কষ্টে সংসার বন্ধন বজায় রাখিতে চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু ব্রজেশ্বর ও অন্যান্য পরিবারবর্গের বুদ্ধির তারতম্যে সময়ে সময়ে হিতে বিপরীত ঘটিত; অকারণ মনোমালিন্য হইয়া পরিবারবর্গ সকলকেই অশান্তিভাবে মনোকষ্টে থাকিতে হইত। ইচ্ছামত কেহ কার্য্য করিতে পায় না, অশান্তি সংসারে ব্যাপ্ত, সকল জ্বালা যন্ত্রণা একমাত্র মায়াসুন্দরীকে ভোগ করিতে হয়, তাঁহার মুখ চাহিতে আর কেহ নাই।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কবিবর ঠিক বলিয়াছেন, 'যার পয়সা নাই, তার মরণ ভাল। সংসার এখন অর্থ লইয়াই, রমাকান্ত যেন কতই অর্থ উপায় করে, যাহা উপায় করে, তাহার সমস্ত সংসারে দেয় না, এই ভাবিয়াই বাটীর সকল লোকে সাধনাকে বাক্য যন্ত্রণা দেয়, তাহারা ভাবে রমাকান্ত স্ত্রীর মতেই চলে, তাই সংসারে বাস করা দায় হইয়াছে, সে এখন অনেকের চক্ষু শূল দাঁড়াইয়াছে, সাধনার অসহ্য হইয়াছে। একদা সে কহিল, "দেখ, বয়স বাড়িতেছে বই আর কমিতেছে না, কিন্তু আজও তোমার বুদ্ধি হইল না, কাহার সহিত কিরূপ কথা কহিতে হয়, কাহার প্রতি কেমন ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তুমি কিছুই বুঝ না, তুমি একটা গোলমাল বাধাইয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাও, আর সারাদিন আমাকে ব্যাঙ্গ খুঁচুনীর মত জ্বালা যন্ত্রণা সহিতে হয়। আমি মনে করিয়াছিলাম তোমায় কোন কথা বলিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, কিন্তু আর আমার সহ্য হয় না; আমার মাথা খাও, এখন হইতে বুঝিয়া চল, যে কথায় লোকের মনে কষ্ট হয়, এমন কথা মুখে আনিও না।" সাধনা স্বামীকে গৃহে পাইয়া এই কয়েকটী কথা বলিল।

রমাকান্ত পত্নীকে ইতিপূর্ব্বেই ক্ষুণ্ণ মনা দেখিয়াছিল, এখন সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, তাহার কথান্তরে বোধ হয়, পরিবার বর্গের কাহারও অসন্তোষ হইয়া, থাকিবে, তাহার প্রতিশোধে সাধনাকে গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছে, সে জন্য সহধর্ম্মিণী এরূপ কাতর ভাবে বিলাপ করিল, সে সাধনাকে সান্ত্বনা কারণ উত্তর করিল, কেন আজত আমার সঙ্গে কাহার কোন বাকবিতণ্ডা হয় নাই, তবে তোমাকে কে কি বলিয়াছে? আমি শুনিতে চাই; ভাল, আমার সঙ্গে কাহারও কোন বিবাদ বাধিয়া থাকে, সে আমার সহিত বুঝিবে, তোমাকে তাহার জন্য মনোকষ্ট পাইতে হয় কেন? তুমিত কোন দোষের দোষী নও, দোষ হইয়া থাকে, সে আমার, তাহাতে তোমাকে যদি কোন কথা সহিতে হয়, সে বড় অন্যায় "অবশ্য আমি ইহার শোধ লইব।"

সা। তোমার আর কোন ক্ষমতা থাক না থাক, ন্যায়ের বিচার করিতে খুব মজবুত। এ সব কি মীমাংসা হয়? তুমি ভাবিতেছ যে তুমি কোন অন্যায় কর নাই, কিন্তু অন্যায় কর বা না কর, তোমার কথায় লোকে কষ্ট পায়। তুমি এককথার প্রত্যুত্তরে আর এক কথা আনিয়া বড় গোলযোগ বাধাইয়া দাও, কথার উত্তর দিবার সময় বুঝিয়া কথা কহিলে কোন গোল বাধে না; কিন্তু রাগিয়া উঠিলে তোমার জ্ঞান থাকে না, ভাল কথা মন্দভাবে লইয়া একটা সামান্য বিষয় গুরুতর করিয়া তুল, এখন কি আর তোমার এরূপ রাগ প্রকাশ সাজে? দেখ তুমি ছেলে মেয়ের বাপ হয়েছ, সংসার ধর্ম্ম করিতে হইলে অনেক সহ্য করিতে হয়। সকল বিষয়ে উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া চীৎকার করিয়া হিতে বিপরীত করিয়া ফেল। শ্রীকান্ত কনিষ্ঠ হইলেও তোমার অপেক্ষা তাহার কথার বাঁধনি আছে।

রমা। আমার সে ভাব দেখাইবার প্রয়োজন নাই, মুখে এক, পেটে অন্য, সে রূপ কথাবার্ত্তা ঈশ্বর করুন যেন আমায় কখন না কহিতে হয়, সাদাকে সাদা, লালকে লাল বলিতে আমি এক দিনের জন্যও কুণ্ঠিত হইব না। ন্যায় কথায় যদি লোকের বিরাগ ভাজন হইতে হয়, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না।

সা। তুমি গ্রাহ্য কর না, সেইত মহাদোষ, তুমি মনে কর, যাহা তুমি কর তাই ভাল, কিন্তু তাহাতেই পরিণামে তোমাকে কষ্ট পাইতে হয়। আমার বলিবার অধিকার না থাকিলেও আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তুমি লোকের সহিত কথা কহিতে জান না, দেখ নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছ যে, তোমার কথার দোষে অনেক সময়ে লোকে ভাবে তুমি বেশী উপায় কর। তুমি এক ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ কর, কিন্তু তাহা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অন্য ভাব দাঁড়াইয়া যায়। আমার কথা শুন, তুমি রাগ সম্বরণ কর, তোমার ক্রোধ পরম শত্রু।

রমা। সাধনা! তুমি যাহা বলিতেছ সকলই সত্য, আমার রাগেতেই সকল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অন্যায় দেখিলে আমার মন কেমন এক কালে চটিয়া যায়, আমি আর স্থির থাকিতে পারি না, প্রাণ কেমন করিতে থাকে।

সা। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, রাগিয়া যাহাকে তাহাকে যথেচ্ছ ভাবে কথাবার্ত্তা বল, তাহাতে কি তুমি মনে সুখী হও? তোমাকেও ত শেষে তাহার জন্য ব্যথা পাইতে হয়। যদি সকল সময়ে মনে ব্যথা না পাও, কিন্তু কতকটা অনর্থক চীৎকার করিয়া নিজের শরীর নিজেই মাটি কর।

রমা। তাহার আর সন্দেহ কি? ভাল, ক্রোধ কি

প্রকারে দমন করিতে পারি? আমাকে শিখাইয়া দাও, আমি কথা কহিতে কহিতে অসঙ্গত দেখিলেও আর কাহারও উপর রাগিয়া উঠিব না। তুমি আমায় অনেক বিষয়ে সতর্ক করিয়াছ, তোমার মত গুণবতী স্ত্রী জগতে দুর্লভ, আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট যে সর্ব্বগুণ সম্পন্না তোমাকে পাইয়াও আমি স্বভাব চরিত্রের উন্নতি করিতে পারিলাম না।

সা। আমি তোমাকে শান্তভাব দেখিতে ইচ্ছা করি, দেখ সংসারে সর্ব্বত্র শান্তিরই জয়, লোকের উপর ক্রোধ ভাব প্রকাশ করিলে পরিণামে তজ্জন্য নিজেই অনুতপ্ত হইতে হয়। আমি তোমায় অনুরোধ করি লোকের সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা কহিবে, পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। আমি তোমার ছায়া ও দাসী মাত্র, ছোট মুখে বড় কথা সাজে না, কিন্তু তোমার বলেই আজ আমি কয়েকটী কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি, যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, চরণে ধরিতেছি, আমায় ক্ষমা করিও।

পতিপ্রাণা সাধনা পতির শুভাকাঙ্ক্ষিণী, যদিও পতির জন্য পরিবারবর্গের নিকটে সময়ে সময়ে তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত, তথাচ স্বামীর চিত্ত-বিনোদন ও স্ফূর্ত্তি সম্পাদনে কদাচ কোন বিষয়ে তিনি উপেক্ষা করিতেন না। প্রকৃতপক্ষে রমাকান্ত যে পরিবার লইয়া সংসার আশ্রমে দিন যাপন করিতেছেন, তাহাতে, সাধনা ব্যতীত প্রকৃত তাহার শুভানুধ্যায়িনী আর কেহই ছিল না। সাধনা রমা-কান্তকে নীরব ভাবে কাল যাপন করিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, হয়ত স্বামী তাহার কথায় মর্ম্মাহত হইয়াছে, অথবা তাহার বাক্যে তাহার জ্ঞান বিকাশ হইয়াছে। এখন হইতে সে অন্যের সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ সাবধান

থাকিবে। রমাকান্তও আর কোন কথা কহিল না। রজনীও অধিক হইয়াছিল, উভয়ে অচিরে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইল।

ব্রজেশ্বরের পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ব্রজেশ্বর যথাক্রমে অবস্থাপন্ন ঘরে চারিটী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের তিনটী বৈধব্য দশাগ্রস্ত হইয়া পিতার গলগ্রহ হইয়াছে, একমাত্র কনিষ্ঠ কন্যাটী স্বামী সুখে বঞ্চিতা হয় নাই। জ্যেষ্ঠা কন্যাটীর শ্বশুর বাটীর বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, তাহাতে তাহার এক প্রকার কাটিয়া যায়; কিন্তু অন্য কেহ অভিভাবক না থাকায় তাহাকে অনেক সময় পিতৃগৃহে কাটাইতে হয়। অন্য দুইটী কন্যা উপযুক্ত বরে অর্পিতা হইলেও স্বামী রত্নে বঞ্চিতা হইয়া শ্বশুরের সম্পত্তিতে বৈমুখ হইয়াছে; পল্লীগ্রামের বিষয় লইয়া জামাতা ভ্রাতা বা অন্য আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিয়া উদ্বিগ্ন হইতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি নাই। তিনি স্থির ভাবিয়াছেন যে, যদি তাঁহার নিজের আহার ও পরিধের বসনের উপায় হয় তবে কন্যাদ্বয়েরও হইবে।

ব্রজেশ্বরের সহিত কলিকাতার অনেকের আলাপ পরিচয় হইয়াছে, অবস্থাহীন হইলেও লোকের নিকট তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভ্রম আছে। শ্রীকান্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছে, বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বর্ষ, শ্রীকান্তের বিবাহের কথা অনেক স্থান হইতে আসিতেছে, কিন্তু ব্রজেশ্বর মনে মনে নির্দ্ধার্য্য করিয়াছে, কোথাও কথা নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ সময়ে তিনি সকল ভার যে আত্মীয়ের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আর ইহ সংসারে নাই, সুতরাং সকল ভার ব্রজেশ্বরী,

কেই গ্রহণ করিতে হইল। রমাকান্ত কাজ কর্ম্মে উপযুক্ত হই য়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাবধি তাহাকে কোন কার্য্যের ভার দেওয়া হয় নাই, তাহাতে রমাকান্তের প্রকৃতি পিতৃ সদৃশ নহে। শ্রীকান্তের বিবাহে ব্রজেশ্বরের সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার লইবার কথা, রমাকান্তকেও আবশ্যকীয় কার্য্যাদি করিতে হইবে; কিন্তু পিতা পুত্রে মতান্তর হওয়ায় ব্রজেশ্বর স্বয়ং সকল কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন, রমাকান্ত পিতার যথাযোগ্য সাহায্য করিতে লাগিল মাত্র। পিতার সন্তানের প্রতি বিশ্বাস নাই; তাঁহার ধারণা, রমাকান্ত এক পক্ষে লোকের নিকট ঠকিয়া আসিবে, অন্য পক্ষে দ্রব্যাদি নির্ব্বাচনের শক্তিও তাহার নাই। পিতার মনে যতই কেন অবিশ্বাস হউক না, রমাকান্ত প্রাণপণে তাঁহার সহায়তা করিতে কোন অংশে ক্রটী করিল না, তথাপি যে যে কার্য্যে পুত্রের প্রতি ভার অর্পিত হইয়াছিল, সে সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইলেও ব্রজেশ্বরের পুত্রের কার্য্য তাদৃশ মনঃপুত হইল না। রমাকান্ত বুঝিল, সে তাহার কর্ত্তব্য সাধনা করিয়াছে, ইহাতে যদি পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা তাহারই দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে; কিন্তু কথায় কথায় ব্রজেশ্বর লোকের নিকট পুত্রকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় রমাকান্তের হৃদয় ব্যথিত হইল, সে মনে ভাবিল যে, কয়েকটী কার্য্য তাহাকে করিতে হইয়াছে, না করিলে পিতার এরূপ বিরাগ ভাজন হইতে হইত না। তাহার পূর্ব্বাবধিই ধারণা ছিল যে, পিতা যে সামগ্রী তাহার অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করিবেন, তাহা সকলেরই মনোনীত হইবে, অথচ তাহার সামগ্রী সমতুল্য ও দরে সুলভ হইলেও তৎপ্রতি কেহই সন্তোষ প্রদান করিবে না। তথাপি সে যে

এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা একমাত্র পিতার মনস্তুষ্টির জন্য; কিন্তু পরিণামে তাহার অদৃষ্টে সুখপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে তিরস্কার লাভ হইল। রমাকান্ত ব্যথিত হইল, সে মনের আক্ষেপ মনেই রাখিল। কিন্তু মনের কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিয়া সে প্রকৃতিস্থ হইতে পারে? সাধনা স্বামীর অবস্থা সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিল, রমাকান্তও স্থির বুঝিয়া ছিল যে, সংসারে তাহার একমাত্র বিরাম স্থল সাধনা, রজনীতে একাকী তাহাকে পাইয়া সে তাহার অশান্ত চিত্তে শান্তি লাভ করিবে। এখন প্রকৃত কথায় সাধনাকেও গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, সে দিন তাহাতে তাহারও চিত্ত বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য কতক্ষণে স্বামীর সহিত একত্র হইয়া উভয়ে উভয়ের হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া একের ব্যথা অন্যে গ্রহণ করিবে, এই প্রতীক্ষায় সাধনা সকল কথাই বিস্মৃতা হইয়াছিল। রমাকান্ত অন্যান্য দিন সন্ধ্যার সময় বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কার্য্যান্তরে বা বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিতেন, কিন্তু সে দিবস তাহার মনোবিকার কারণ সে এককালে বাটী হইতে বহির্গত হয় নাই, পুত্র কন্যাকে লইয়া সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া আমোদ প্রমোদে সময়ক্ষেপণ করিল, পরে সাধনা আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ বেড়াইতে গেলে না কেন?"

রমা। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না, সকলই যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে, সংসারে যদি এতই কষ্ট, তবে লোকে সংসারী হয় কেন?

সা। যেখানে দুঃখ সেই খানেই সুখ, একের অভাবে অন্যকে পাওয়া যায় না। কষ্ট না হইলে সুখ লাভ হয় না।

রমা। সাধনা! যদি কষ্ট করিয়া সুখ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনে আর আবশ্যক কি? আমার জীবন যেন অসার বোধ হইতেছে।

সা। ও সকল কথা মুখে আনিও না, যতই দুঃখের চিন্তা করিবে ততই প্রাণ ব্যথিত হইবে। দেখ আমি যদি তোমার প্রাণ সর্ব্বদা এইরূপ ব্যথিত এবং তোমায় অসুখী দেখি, তাহা হইলে আমার প্রাণেই বা সুখ কোথায়? তোমার সুখে আমার সুখ।

রমা। সাধনা! আমি তোমায় লইয়াই সুখী, তোমার মুখের প্রতি চাহিয়া আমি সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই।

সা। তুমি আমায় ভালবাস, তাই তোমার এ ভাব। ভগবান করুন, যেন তোমায় সুখী রাখিয়া চিরদিন সুখে থাকিতে পারি।

রমা। সাধনা! আমি তোমার বলে বলীয়ান, তোমার শক্তি লইয়াই আমি শক্তি পাইয়াছি, যখন তোমার সহিত নির্জ্জনে বসিয়া উভয়ে উভয়ের হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করি, তখন আমার প্রাণে যেন অতুল আনন্দ উথলিয়া উঠে, সে বেগের সীমা নাই। আমি জানি তোমার মত বুদ্ধিমতী রমণী এ সংসারে অতি বিরল, সংসারে আমি যাহা কিছু সুখ সম্ভোগ করি, তুমিই তাহার মূল। ঈশ্বর আমার প্রতি নিতান্ত সদয়, তাই তিনি তোমাকে আমার নিকট দিয়াছেন। তোমার কথামত কার্য্য করিতে পারিলে, পৃথিবীতে আমার কোন অভাবই থাকিত না; কিন্তু আমি নিতান্ত মূঢ় অজ্ঞান, তাই তোমার শক্তি তোমার গুণ উপেক্ষা করিয়া বিষয়ান্তরে আসক্ত হই, সুতরাং পরিণামে পরিতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে থাকি।

আমি বড় ভাগ্যহীন, তাই আমি তোমার কথা বুঝি না, তুমি বারে বারে আমায় সতর্ক করিয়া দাও, সাবধানে থাকিতে বল; কিন্তু কার্য্যকালে আমি ঠিক তাহার বিপরীত করি। আমি মনে মনে তোমার কথামত কার্য্য করিতে কতবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আমার রক্ষা হয় নাই। এখন হইতে সাধ্যমত সতর্ক হইতে চেষ্টা করিব, স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হইলে কোন পক্ষেই আমি মঙ্গল দেখিতেছি না, আমি স্বভাব দোষে নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমার মত এ সংসারে হেয় আর কে আছে?

সা। তুমি কাযের সময় সকল কথা ভুলিয়া যাও, তোমার কোন কথাই মনে থাকে না। আর এখন ও সকল কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই; তবে যদি আমায় সুখী দেখিতে ইচ্ছা কর, নিজের চিত্তে শান্তি লাভ কর। ভাল মন্দ সংসারের ঘটনাচক্রে দিবা রাত্রি চলিতেছে, মনের শান্তিবলে দুঃখ সুখে পরিণত হইতে পারে।

স্বামী স্ত্রী উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তায় রাত্রির অধিকক্ষণ উভয়ের প্রীতি সম্পাদন করিলেন। নিদ্রাদেবী অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদের কথোপকথনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপেক্ষায় ছিলেন, সুযোগ মতে সময় বুঝিয়া তিনি দুইজনকেই শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিলেন, ক্ষণকাল পরে সাধনা বা রমাকান্ত কাহার বাক্য শ্রুতিগোচর হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

উন্নতি লাভ ইচ্ছা করিলেই হয় না, কিন্তু অধঃপতন অনায়াসে হয়, যে ব্যক্তি উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়া গ্রহ বৈগুণ্যে পদস্খলিত হইয়াছেন, তাঁহার অবস্থা জীবন্মৃত ভাবে পরিণত হইয়া থাকে, সে জীবনে উৎসাহ নাই, উদ্যোগ নাই, সর্ব্বদাই নিরাশ-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে বিশৃঙ্খল ভাবে তাহার দিন কাটিয়া যায়। শ্যামলালের অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আশা ভরসা সকলই লোপ পাইয়াছে, ভগ্নোৎসাহ হইয়া লোক কত দিন জীবন ধারণ করিতে পারে? তিনি বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে বিস্তর অর্থের সংস্থান করিয়াছিলেন, একদিনে সকলই শেষ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আধি ব্যাধি অশান্তি আসিয়া তাঁহার দেহ-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্বল্প দিনেই তিনি উৎকট রোগগ্রস্ত হইলেন, পীড়ার প্রতিকার জন্য কয়েকজন ডাক্তার বৈদ্য নিযুক্ত হইলেন বটে; কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার দর্শিল না, তিনি মরণ সন্নিকট জানিয়া অবশিষ্ট যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল ঘনরামের নামেই উইল করিয়া দিলেন।

ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই কৃষ্ণলাল ভ্রাতৃসদনে

উপস্থিত হইয়াছিলেন, একদিবস কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের রুগ্ন শয্যায় বসিয়া আছেন, দর দর ধারে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রু-ধারা নিপতিত হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার মুখের প্রতি শ্যামলালের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি কাতর কণ্ঠে বলি-লেন, ভাই রোদন করিতেছ কেন? জন্মিলেইত মৃত্যু অব-ধারিত রহিয়াছে, আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, বিধাতার নিয়মাধীনে আমার অস্তিত্বের লোপ হইবে, সংসারের গতিই এই। এক যায় আর আসে, আশীর্ব্বাদ করি তোমার দিন দিন উন্নতি হউক, সুখে সচ্ছন্দে পুত্র কন্যা লইয়া সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর। দুঃখ এই ঘনরাম মানুষ হইল না, তাহাকে আজ উন্নত জীবন লাভ করিতে দেখিলে আমার এ মৃত্যুতেও আনন্দ হইত। জ্যেষ্ঠের বাক্য শেষ হইতে না হইতে কনিষ্ঠ উত্তর করিলেন, বাল্যকালেই পিতা ঠাকুর পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু আপনার স্নেহে ও যত্নে সে অভাব অনুভব করিতে পারি নাই, সুতরাং আপনি ব্যতীত আমার আর সহায় সম্পত্তি কে আছে? আপনিই আমার এক মাত্র রক্ষক ও অভিভাবক, আপনিই যদি আমাকে অনাথ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে আর জীবন ধারণে প্রয়ো-জন কি? ঘনরাম এই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র; বিষয় বুদ্ধি তাহার এখনও কিছু জন্মায় নাই, এতদিন তাহাকে বিষয় চিন্তায় জড়িত হইতে হয় নাই, আপনার অবর্ত্তমানে এ সংসার তাহার পক্ষে ভীষণ অন্ধকার বলিয়া বোধ হইবে, সে যখন সংসার ধর্ম্ম বুঝিবে, তখন আপনার উপদেশ বাক্য অব-হেলা করিয়া সে যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া নয়নজলে ভাসিবে। কার্য্যাভ্যন্তরে পড়িলেই বিষয় বুদ্ধি আপনি যোগাইয়া আইসে, আপনি এ সংসারের ভবিষ্যতের বিষয়

ভাবিয়া ব্যথিত হইবেন না, ঈশ্বর করুন আপনি নির্ভাবনায় সত্বর আরোগ্য হইয়া উঠুন।

শ্যাম। ভাই জীবনের আশা বহু দিন ফুরাইয়াছে, সংসারের কিছুতেই আমার প্রবৃত্তি নাই। এখন মৃত্যু হইলেই শান্তি লাভ করি। অবোধ নিজের মঙ্গল বুঝিল না, নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিল, আমার কি? আমার সহিত তাহার জীবনাবধি সম্বন্ধ, নয়নদ্বয় মুদিত হইলে আর আমাকে তাহার ভাল মন্দের জন্য ভাবিতে হইবে না।

কৃষ্ণ। দাদা, এ সময়ে আপনি যতই এই সকল কথা লইয়া আন্দোলন করিবেন, ততই আপনার প্রাণ আকুল হইবে, এবং তাহাতে শারীরিক সমধিক কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। আর ও সকল কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই, আপনি নিশ্চিন্ত মনে শান্তি লাভ করুন।

শ্যাম। ভাই! তুমি যাহা বলিতেছ আমি সকলই বুঝিতেছি; মায়ার কি কঠিন বন্ধন, যত দিন না সে মোহ শরীর হইতে দূর হইতেছে, ততদিন প্রাণ অনিবার সংসারের জন্যই কাঁদিয়া থাকে, তাহার আর কোন ভাবনা চিন্তা নাই। তুমি বলিবে কেন, আমি নিজে নিজেই নিশ্চিন্ত থাকিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পারি কৈ? যিনি করিবার তিনিই করিবেন, তথাপি আমার অবর্ত্তমানে সংসারের কি ঘটিবে, আমি তাই ভাবিয়াই ব্যাকুল হইতেছি।

ভ্রাতৃদ্বয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে ঘনরাম আসিয়া পিতৃগৃহে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বে ঘনরামকে কৃষ্ণলাল যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, আজ যেন তাহার সে ভাবের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণলালকে ঘনরাম জিজ্ঞাসা করিল, কাকা মহাশয়! কেমন দেখিতেছেন?

কৃষ্ণ। কেন! দাদা সত্বরেই আরোগ্য লাভ করিবেন, তোমার ভাবনা কি? যাও স্নানাহার করগে, বেলা অধিক হইয়াছে।

ঘন। না খুড়া মহাশয়, আমার বাবার জন্য প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিতেছে, কিছুই আমার ভাল লাগিতেছে না।

কৃষ্ণ। ভগবানকে ডাক, তিনিই আরোগ্য করিবেন। তুমি আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিতে পারি?

পুত্রকে সম্বোধন করিয়া শ্যামলাল কহিলেন, দেখ বাবা! তুমি আমার জন্য ভেবনা, যদিই আমার কোন ভাল মন্দ হয়, তুমি সাবধানে চলিও, সেই আমার পরম সুখ। সময় হইলেই সংসার হইতে সকলকে বিদায় লইতে হইবে, সে গতি রোধ করিবার কাহারও অধিকার নাই। তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না; ঘনরাম ক্রন্দন করিতে লাগিল।

পরে শ্যামলাল ভ্রাতার প্রতি কহিলেন, "ভাই! দেখিতে দেখিতে বেলা অনেক হইয়াছে, হয়ত তোমার জন্য সুধারাম ও বধূমাতা কতই ভাবিতেছেন; অতএব আর বেলা কর না, আমার একমাত্র আশা ভরসা তোমরা। তুমিত আমার সমস্তই জান, তুমি রহিলে দেখো শুনো। আর আমা কর্ত্তৃক তোমার প্রতি যে সকল অন্যায় ব্যবহার হইয়াছে, জীবনান্তে সব ভুলিয়া যাইও, তোমাকে আর অধিক কি বলিব। এই কয়েকটী কথা কহিয়া শ্যামলাল আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কৃষ্ণলালের আহারাদি রহিত হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠের যথাবিধি সংকার করিলেন।

কয়েক দিবস মাত্র শ্যামলাল ইহ সংসার হইতে বিদায়

লইয়াছেন। স্বামীর ঐশ্বর্য্যে যে চঞ্চলা ধরা সরা প্রায় দেখিত, লঘু গুরুর বিচার করিত না,' এক্ষণে পতিবিয়োগ বিধুবা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার সুখের দিন শেষ হইয়াছে. তেজ দর্প অহঙ্কার স্বামী বর্ত্তমানে সকলই শোভা পাইত, এখন তাহার আর সে দিন নাই। ঘনরাম পিতার জীবদ্দশায় ফাঁকি দিতে গিয়া নিজেই বঞ্চিত হইয়াছে; তাহার মনে মনে বড় আশা ছিল যে, পিতার অবিদ্যমানে পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির একমাত্র ভোগ দখলকারী হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিবে; কিন্তু গ্রহ বৈগুণ্যে শ্যামলাল জীবনের শেষ দশায় নিজ সম্পত্তির অধিকাংশই নষ্ট করিয়া গিয়াছেন, এখন দুঃখে কষ্টে পরিবার প্রতিপালনই ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্যামলালের জনসমাজে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, তিনি কলিকাতার বংশ মর্য্যাদায় বড় গণ্য মান্য মিত্র পরিবারের সদ্গুণ সম্পন্না এক রূপবতী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

মাতার সহিত ঘনরামের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না, অভাগিনী চঞ্চলা পতি সোহাগে বঞ্চিতা হইয়া ভাবিয়াছিলেন যে, স্নেহময় পুত্র হইতে তাহার কথঞ্চিৎ সুখ হইবে, এখন দেখিলেন, তাঁহার কপাল এককালে ভাঙ্গিয়াছে; ঘনরাম উত্তরাধিকারী, এজন্য টাকার জন্য জননীর সহিত সদা সর্ব্বদাই বিসম্বাদ বাধাইতে লাগিল। পিতার অবর্ত্তমানে হয়ত পুত্রের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, মাতা ইহা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বুঝিলেন, সে অপেক্ষাকৃত অধিক বিলাসী হইয়াছে। যাহার জন্য চঞ্চলার পতি ও অন্য কত লোকের সহিত মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে, আজ সেই আদরের পুত্র ঘনরাম মাতাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবে কত কথাই কহিতেছে। চঞ্চলা দারুণ অভিমানিনী, তাঁহার কথায় কথা

কহিবার এমন কি শ্যামলালেরও অধিকার ছিল না, কিন্তু সে দিন তাঁহার আর নাই। এখন সংসার ছন্ন ভন্ন ভাবাপন্ন হইয়াছে।

চঞ্চলার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহা হইতেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দাঁড়াইয়াছে, শ্যামলাল একমাত্র গৃহিণীর প্রলোভন বাক্যে উত্তেজিত হইয়া বিনা দোষে ভ্রাতার মনোক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। চঞ্চলা এখন বুঝিয়াছেন যে, দেবরের সহিত মনান্তর না থাকিলে, তিনি এ সময়ে তাঁহার পক্ষে বিশেষ সহায় হইতেন, দিন দিন তাঁহার যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতেছে, হয়ত তাঁহাকে একমুষ্টি উদরের অন্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের কারণ অন্যের গলগ্রহ হইতে হইবে।

যথাকালে শ্যামলালের শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হইয়া গেল। কৃষ্ণলাল সময় পাইলেই অগ্রজের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতষ্পুত্র ও ভাইজের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, ঘনরামকে উপদেশ দিতেন। কৃষ্ণলাল বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মাতা পুত্রে তাদৃশ সদ্ভাব নাই।

যে গৃহে বহুসংখ্যক বন্ধু বান্ধবের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দোষনীয় কার্য্য এক দিনের জন্যও প্রকাশ পায় নাই, এখন ঘনরাম সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধব লইয়া সেই বাটী সেই বৈঠকখানা কলঙ্কিত করিতেছে। একদা কৃষ্ণলাল হঠাৎ ঘনরামের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহার বিকৃত ভাব গতি সকলই বুঝিতে পারিলেন। ভ্রাতষ্পুত্র অসৎপ্রবৃত্তির দাস হইলেও এখন পিতৃব্যকে মৌখিক ভক্তি প্রদর্শনে কদাচ উপেক্ষা করিত না। মাতার সহিত পুত্রের যাহাতে সদ্ভাব হয়, অগ্রজের বংশ মর্য্যাদা ও সংসার রক্ষা হয়, সেই উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণলাল আজ ঘনরামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। পিতৃব্যকে দেখিয়া ঘনরামও

যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিল। কৃষ্ণলাল উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবাজীউ শারীরিক কুশলত।"

ঘন। আজ্ঞে হাঁ, তবে দিন দিন মাতা ঠাকুরাণী আমার সহিত বড়ই গোলযোগ বাধাইতেছেন।

কৃষ্ণ। ছি বাবা! ও কথা কি মুখে আনিতে আছে? সংসারে মাতার সম পূজ্যা আর কে আছেন? পূজনীয়া জননীর সহস্র ত্রুটী হইলেও তাঁহার অপরাধ অপরাধ বলিয়া গ্রহণ করা কদাচ তোমার উচিত নহে। তোমার জ্ঞান হইয়াছে, বয়স বাড়িতেছে, বিষয় কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছ, মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবে, এইত বুদ্ধিমানের কাজ।

ঘন। খুড়ো মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সঙ্গত বটে, কিন্তু আপনিত মাতার স্বভাব চরিত্র সবিশেষ অবগত আছেন, আপনি যে এত নিরীহ, তথাপি আপনার অনিষ্টও তিনি করিয়াছেন।

কৃষ্ণ। বাবা! সে সব কথা ছাড়িয়া দাও, সংসারে সকল দিন সমান যায় না, আজ কাল দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভাই ভাই যে ঠাঁই ঠাঁই দাঁড়াইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমার অদৃষ্ট দোষেই ঘটিয়াছে, বড় বৌঠাকুরাণীর অপরাধ কি?

ঘন। খুড়ো মহাশয়! আপনি যে মাতাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিতেছেন, সেআপনার মহত্বের পরিচয়।

কৃষ্ণ। এখন সে সকল কথার প্রয়োজন নাই। বাবাজীউ! আমি তোমাকে গুটি কয়েক কথা বলিতে আসিয়াছি, আমি জানি তুমি তাহা শুনিবে।

ঘন। খুড়ো মহাশয়! সংসারে একমাত্র আমার মুখের

প্রতি তাকাইতে পিতা মহাশয় ছিলেন, যদিও আমি তাঁহার স্বসন্তান নহি, তথাপি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এখন সংসারে আপনি ব্যতীত আমার মুখের প্রতি তাকাইতে আর কে আছে? আপনি যাহা আদেশ করিবেন, অবশ্য তাহা পালনে আমি বিশেষ যত্ন করিব।

কৃষ্ণ। বাবাজীউ! তোমার পিতৃদেবের অভাবে সংসার তোমার স্কন্ধেই পতিত হইয়াছে, তুমি না দেখিলে শুনিলে, বুঝিয়া কার্য্য না করিলে তোমাকেই পরিণামে কষ্ট পাইতে হইবে। যত বয়স বাড়িবে ততই সংসারের গুরুভার তোমার স্কন্ধেই পড়িবে; তাই বলি সংসারে একমাত্র তোমার জননী ব্যতীত অভিভাবক হিসাবে আর কেহ নাই। বধূমাতা ঠাকুরাণী এখন বালিকা মাত্র, বিষয় বুদ্ধি তাহার এখনও কিছু হয় নাই। তোমার মাতার বিষয়বুদ্ধিতেই তোমার পিতা সম্পত্তি সংস্থান করিয়া ছিলেন, কিন্তু বাবা তুমি যদি এখন বুঝিয়া না চল, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, বাকি যাহা আছে তাহাতে ক দিন চলিতে পারে! যাহাতে পিতার নাম বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে পার, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হও। এখন সংসারে তোমার সার কার্য্য মাতৃ আজ্ঞা পালন করা, দেখ মাতা পিতা পুত্রকে সুখী দেখিলেই মনের আনন্দ লাভ করেন, আমি তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি মাতার আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। আমার কথা শুন, পরিণামে তোমার মঙ্গল হইবে।

ঘন। মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন, অবশ্য সকলই যুক্তি সঙ্গত, কিন্তু মাতা সন্তানের সুখের প্রতি না তাকাইলে, পৃথিবীতে তাহার সকলেই শত্রু; কেন যে তিনি আমার প্রতি

এরূপ বিরূপ ভাব দেখাইতেছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

কৃষ্ণ। ঘনরাম! অমন কথা কল্পনায়ও ভাবিও না, তুমি ভিন্ন তোমার মার আদরের সামগ্রী আর কে আছে? মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে বিধাতা অনুকূল হইবেন। মাতার মনে কষ্ট দিয়া যখন যে কাজ করিতে যাইবে, স্থির জানিও কখন বিধাতা তাহাতে অনুকূল হইবেন না; পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইয়া কেবল মাত্র কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, এস একবার বাটীর ভিতর যাই।

ঘন। চলুন, আপনার সরল প্রকৃতি, তাই আপনি সকলই সরলতা পূর্ণ দেখিতেছেন, আপনি আমার মার প্রকৃতি সম্যক্ অবগত নহেন। হয়ত আপনাকেই কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবেন।

কৃষ্ণ। আমাদের ত দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন রুষ্ট তুষ্টে সমভাব দাঁড়াইয়াছে, সে জন্য তোমার চিন্তা কি! আমি তোমাদের সুখী দেখিলেই সুখী।

কৃষ্ণলাল ভ্রাতষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। দাম্ভিকা চঞ্চলা নিজ গৃহে বসিয়া ছিলেন, কৃষ্ণলাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকে প্রণাম করিয়া কহিল; বৌ দিদি! সংসারে ঘনরাম ব্যতীত তোমার আদরের সামগ্রী আর কে আছে? ঘনরাম বাল্যকাল হইতেই বিপথগামী, দাদা মহাশয় নাই, সুতরাং এখন তোমাকেই তাহার সকল ভার লইতে হইবে। ঘনরামের উপর তোমার রাগ করা আর সাজে না, তুমি উহার প্রতি বিরূপ হইলে কে তাহার মুখের প্রতি চাহিবে?

চঞ্চ। ঠাকুর পো! আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, যাঁহার হাতে পড়িয়াছিলাম, তিনি আমায় বিশেষ যত্নে রাখিয়া

ছিলেন, একদিনের জন্য তাঁহার মুখে একটা কটু কথাও শুনি নাই, কিন্তু এখন আমার কি দুর্দ্দশা দাঁড়াইয়াছে, তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন, আমাকে জীবন্মৃত ভাবে দিন কাটাইতে হইতেছে, ভগবান যে আমার অদৃষ্টে এত কষ্ট লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি এক দিনের জন্য স্বপ্নেও ভাবি নাই। একবার মনে ভাবিয়াছিলাম যে তোমায় ডাকাইয়া মনের কথা জানাইব, কিন্তু লজ্জায় তোমাকে ডাকাইতে সাহসী হই নাই, তুমি আপনি আসিয়াছ, এখন সকল কথা শুনিয়া ভাল মন্দ বিচার কর।

কৃষ্ণ। বৌ দিদি! পুত্রের সহিত বিবাদ হইয়াছে, তাহার আবার বিচার কি? পুত্র সহস্র গুণে অপরাধী হইলেও সে তোমার আদরের সামগ্রী ও স্নেহের ধন, দেখ পুত্রের সামান্য জ্বর হইলে মাতা অস্থির হন। তুমি কি ঘনরামকে একদিন আহার না করাইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিবে?

চঞ্চ। ঠাকুর পো! আমার মন বড় খারাপ হইয়াছে, ওর কুব্যবহারে ওর মুখ দেখিতে আমার ইচ্ছা হয় না, আর অধিক তোমায় কি বলিব! কথা বার্ত্তাতেও রস নাই, যত দিন যাইতেছে, ততই গোঁয়ার হইয়া উঠিতেছে, কাহার সহিত কিরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে হয়, আজও কি উহার সে জ্ঞান হয় নাই? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

কৃষ্ণ। ভাবিয়া দেখিলে সংসার সুখের ঠাঁই নহে, তবে বাসনা পূরণ জন্য দুঃখে সুখে দিন কাটান মাত্র, চিরদিন ঘনরাম আমোদ প্রমোদেই কাটাইয়াছে, তুমি বরাবর আদর দিয়াছ; তোমার আদরেই তাহার এরূপ ভাব গতি দাঁড়াইয়াছে; এখন তুমি বিরূপ হইলে উহাকে ত্রিভুবন আঁধার দেখিতে হইবে। গৃহিণী হইতেই সংসার রক্ষা হয়, ঘনরাম সম্বন্ধে

দোষে দোষী হইলেও তোমার স্নেহের সামগ্রী, তুমি উহার আবদার সহ্য না করিলে কে আর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তুমি উহার অপরাধ ক্ষমা কর, সময়ে ঘনরামের মতি গতির পরিবর্ত্তন হইবে, সময়ে সে বুঝিবে যে, তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়া উহাকে অন্তর্জ্জালায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হইয়াছে।

চঞ্চ। ঠাকুর পো! তোমার কথায় আমার প্রাণ শীতল হয়, মায়ের পেটের ভায়ের সহিত কথা কহিয়াও আমি এমন সুখী হই নাই। ভাল, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট থাক, আমি তাহাই করিব। কর্ত্তা তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আমি পর্য্যন্ত লজ্জিত আছি। না জানি ভগবান সেই পাপে আমার কতই দুর্দ্দশা করিবেন। নতুবা ঘনরাম ব্যতিরেকে সংসারে আমার আদরের বস্তু আর কে আছে? সে ঘনরাম যে আমার প্রতি এরূপ কুৎসিত ভাব দেখায়, ইহা আমার পাপের শাস্তিভোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কৃষ্ণ। তোমার স্নেহে আমি মাতৃ অভাব অনুভব করি নাই, সন্তানের নিকট মাতার আবার কুণ্ঠিত ভাবের প্রয়োজন কি? তুমি আমার নিকট কোন অংশেই অপরাধী নহ, তুমি ওকথা মনোমধ্যেও ঠাঁই দিও না, আশীর্ব্বাদ কর, যেন জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিন একরূপে কাটিয়া যায়।

চঞ্চ। এ সকল কথা তোমার সরলতার বিকাশ মাত্র, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে থাক, তুমি যাহা ভাল বুঝিবে আমি তাহাই করিব।

কৃষ্ণ। ঘনরাম! জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী মায়ের পায়ে ধর, দেখ সংসারে মাকে যে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছে, সেই সুকৃতি

লাভ করিয়াছে, মনে স্থির জানিও জনক জননী অপেক্ষা সংসারে হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেহ নাই।

কৃষ্ণলালের কথামত ঘনরাম চঞ্চলার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃত অপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। চঞ্চলা পুত্রের বিনয় নম্রতায় অন্তর ব্যথা দূর করিল। কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে; দুই দশ দিন পরে ঘনরাম নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া আবার সম্পত্তি নষ্ট ও বিবাদ করিতে লাগিল।

বিষয় সূত্রে ঘনরামের সহিত চঞ্চলার মনান্তর কৃষ্ণলাল মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া ছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে মাতা পুত্রের বিশেষ সদ্ভাব হয় নাই, সময়ে সময়ে নানা কারণে উভয়ের বিবাদ হইত।

কৃষ্ণলাল আগ্রহ সহকারে দুই চারি বার উভয়ের সম্প্রীতির কারণ সচেষ্ট হইয়াও যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার কথার কোন মূল্য নাই, তখন তিনি নিরস্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে ঘনরাম সাবালক হইয়া বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল। ইচ্ছামতে মাতার সহিত কখন কখন পরামর্শ করে, কিন্তু সে স্বেচ্ছামতেই কার্য্য করিয়া থাকে। মাতা স্ত্রীলোক, বিশেষ বুদ্ধিমতী হইলেও পুত্র বিদ্যমানে বিষয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার অধিকার নাই, সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বে তিনি পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়াছেন।

যে সংসারে গুরুজনের যথাযোগ্য সম্মান নাই, মান্যের ত্রুটি লক্ষিত হয়, সচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও তথায় অশান্তি বিরাজ করে, অশান্তির আবির্ভাবে শান্তিময়ী লক্ষ্মীর অন্তর্ধান হইয়া থাকে। ঘনরাম পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র অধীশ্বর হইয়া বিলাস ভোগে এতই মাতিয়া উঠিলেন যে, নগদ টাকা কড়ি অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইল, চঞ্চলা পুত্রের ব্যবহারে

মর্ম্মাহত হইলেন বটে, কিন্তু প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া মনের দুঃখ মনেই সম্বরণ করিলেন। ঘনরাম অস্থা-বর সম্পত্তি নষ্ট করিয়াও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই, তখনও তাহার চৈতন্য হইল না, সে স্থাবর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিল।

ঘনরাম বাল্যকাল হইতে বিলাস ভোগে দিন যাপন করিয়াছে, অর্থ কিরূপে সঞ্চয় করিতে হয়, অর্থ উপার্জ্জনে জীবনে কত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই, পৈতৃক সম্পত্তির আয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মাত্র ব্যয়ই করিতেছে, সংসার ধর্ম্ম কিরূপে বজায় রাখিতে হয়, গৃহস্থালী রক্ষার জন্য কত সতর্কতার প্রয়ো-জন, সে সকল তাহাকে এক দিনের জন্যও ভাবিতে হয় নাই, পিতৃহীন হইয়া সংসারের সকল ভার তাহার উপর পড়িয়াছে বটে; কিন্তু সংসারীর যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহার চির-অনভ্যস্ত, পৈতৃক আমলের যে খাজাঞ্চী আছে, তাহার উপরেই সংসার খরচের সকল ভার পড়িয়াছে, সে দিকে ঘনরামের ভ্রুক্ষেপও নাই। যাহার সংসার, তাহার যদি তাহাতে সম্যক দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে কদিন তাহা চলে! সংসার শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। চঞ্চলা সংসার ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাদ বিসম্বাদে তাঁহার চিত্ত বিকার উপস্থিত হওয়ায় তিনি সংসারের ভাল মন্দের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি রাখেন নাই। গৃহিনীর গৃহ ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় অনুরাগের অভাব হইলে গৃহ রক্ষা হয় না, ঘনরাম নিজ আমোদ প্রমোদ ও বিলাস ভোগ লইয়া ব্যস্ত, মাতা পুত্রে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় শ্যামলালের সংসার দিন দিন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, শান্তি নিকেতনে অশান্তির অধিকার হইল।

কৃষ্ণলাল যাহা উপার্জ্জন করেন তাহাতে তাঁহার সংসার যাত্রা একরূপে চলে, কোন' অভাব হয় না, সপরিবারে সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন করেন, ভ্রাতার সংসার দিন দিন যে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা তিনি সম্যক রূপে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, ও তাহার উপায় চিন্তায় কোন অংশেই তিনি ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু নিরুপায় হইয়া সাতিশয় ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে যে জ্যেষ্ঠের সংসার নষ্ট হইতেছে তাহা নহে, অর্থ থাকাতেই নষ্ট হইতেছে, অর্থই অনর্থের মূল। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে নিরুপায় হইয়া ক্ষান্ত হইয়া ছিলেন।

ঘনরাম পিতৃব্যকে মৌখিক ভালবাসিত, তাঁহার নিকট কৃত্রিম আনুগত্য ভাব দেখাইত। কৃষ্ণলাল চঞ্চলা বা ঘনরামের প্রত্যাশী নহেন, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে তাহাদের শুভচিন্তা করিতেন, সাধ্য সাধনায় কোন ফল হইল না দেখিয়াই নিরস্ত হইলেন।

সুধারাম পিতার যাবতীয় গুণাবলম্বী হইয়াছিল, ঘনরাম অপেক্ষা তাহার বয়ঃক্রম অল্প হইলেও সে ভ্রাতাকে বিকৃত ভাবাপন্ন দেখিয়া মনে ব্যথা পাইয়াছিল। কালচক্রের ঘোর পরিবর্ত্তনে যখন ঘনরাম এককালে অস্থাবর সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া পড়িল, সে ভ্রাতাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ ও চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু ঘনরামের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

সরলার হৃদয় কোমলতায় পূর্ণ, অন্যের দুঃখ দেখিলে একেবারে অভিভূত হইয়া যায়, নিজ সংসারে তাঁহাকে কখন মন কষ্টে দিন যাপন করিতে হয় নাই, সহস্র অভাব সত্বেও মনের সুখে তাঁহার দিন কাটিয়াছে, পুত্র কন্যাগণ সকলেই

পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী, তাহাদের কারণ তাঁহাকে মনস্তাপানলে ব্যথিতা হইতে হয় নাই, কিন্তু স্নেহের বিচিত্র মহিমায় তিনি ঘনরামের দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ঘনরামের সহিত রমাকান্তেরও বিশেষ সদ্ভাব ছিল, এজন্য রমাকান্ত শ্বশুর বাটীতে আসিলেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া বাটী যাইত না। সাধনা পিত্রালয়ের সম্বাদ না পাইলে সাতিশয় চিন্তিতা হইত, এজন্য রমাকান্ত সময়ে সময়ে তাহাকে তাহাদের সংবাদ জ্ঞাত করিত। সে মধ্যে মধ্যে শ্বশুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সম্বাদ লইয়া যাইত। এক দিবস রমাকান্ত আসিয়া শুনিল যে, ঘনরামের সহিত তাহার কোন প্রতিবেশীর অকারণ মারপিট হয়, তাহাতে ঘনরাম এক ব্যক্তির কান কামড়াইয়া লইয়াছিল বলিয়া বিচারে তাহার তিনমাসের জন্য সপরিশ্রম করাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় একবৎসর হইল শ্রীকান্তের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্রীকান্তের বিবাহে রমাকান্তের আনন্দ বটে; কিন্তু তাহাকে অদৃষ্ট দোষে নিরানন্দে সে কয়েক দিন কাটাইতে হইয়াছে। একে পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাতে বয়ঃপ্রাপ্ত, এ সময়ে কোথায় পিতা পুত্রে মিত্রভাব হইবে তাহা না হইয়া কথায় কথায় তাহাকে রূঢ় বাক্য শ্রবণ করিতে হইত, এই সকল কারণে তাহার মনে বড় শান্তি ছিল না, তাই তাহার নিরানন্দ। বিবাহের পর শ্রীকান্তের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া আসিল, সে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। শ্রীকান্তের শ্বশুরের যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান আছে, তাই তাহার ইচ্ছা কোনরূপ ব্যবসা বাণিজ্য করে। প্রথমেই একটী সামান্য রকম দোকান খুলিল, পরে শ্বশুরের যে একটী ছাপাখানা ছিল তাহার কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে ছাপাখানা লইয়া শ্বশুরের সহিত মনান্তর উপস্থিত হওয়ায় সে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিল। তৎপরে নিজে অন্য একটী কারবার চালাইতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীকান্তের সহিত রমাকান্তের কোন সূত্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ হইতেছে, পিতার কর্ত্তব্য

মিটাইয়া দেন, জ্যেষ্ঠকে অপমান করার কারণ কনিষ্ঠকে তিরস্কার করেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কি ভাবিলেন, হয়ত শ্রীকান্ত অধিক রোজকারী পুত্র ভাবিয়া অথবা রমাকান্তের প্রকৃতির দোষে তিনি রমাকান্তেরই সে বিষয়ে দোষ দেখিয়া শ্রীকান্তের পক্ষ হইয়া তাহাকে যথেচ্ছ লাঞ্ছিত করিলেন। ক্রমে গৃহ বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিল, এমন কি শেষে এক দিবস ব্রজেশ্বর রমাকান্তকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রমাকান্ত দুঃখে অভিমানে অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিবার জন্য সপুত্রা সাধনাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া নেত্রজলে ভাসিতে ভাসিতে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া পরম বন্ধু পরম হিতকারী প্রতিবেশী এক মহাত্মার ভবনে মহাসমাদরে কাল যাপন করিতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারই উদ্যোগে পিতা পুত্রে বিবাদ মিটিল, রমাকান্ত বাটীতে গেল। রমাকান্ত এতাবৎকাল যাঁহাদিগকে সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ অকাতরে দিয়া আসিতেছে, আজ তাঁহারা শ্রীকান্তের রোজকার দেখিয়া তাহার পক্ষপাতী হইল, এই তাহার আন্তরিক দুঃখ।

সাধনা এখনও পিত্রালয়ে বাস করিতেছে, রমাকান্ত মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যায়। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর সাধনা বিবাহিতা হইয়াছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই সাধ আহ্লাদ হৃদয়ে বলবতী হয় বটে, কিন্তু সাধারণে যাহাকে আমোদ প্রমোদ ভাবিয়া থাকে, সে সাধ আহ্লাদ সাধনার মনোমধ্যে উদয় হয় না। সামাজিক নিয়মানুসারে সে সকলের সহিত এরূপ ভাব দেখাইয়া থাকে, যে তাহার মনোগত অভিপ্রায় ও অভাব পর্য্যন্ত অন্য লোকে বুঝিতে পারে না। কৃষ্ণলালের পরিমিত

আয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, বহু কালের পর কন্যা বাটীতে আসিয়াছে, বিবাহের পর হই-তেই সাধনা বৎসরের অধিক দিন শ্বশুরালয়েই অবস্থিতি করে, কন্যাকে সম্মুখে লইয়া সাধ আহ্লাদে মত্ত হওয়া পতি পত্নী সকলের অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটে না। সাধনার গুণে জগৎ সংসার মুগ্ধ, পিতা মাতা যে, সে দুহিতার আদর যত্ন করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? কৃষ্ণলাল সাধনার আহার কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, যাহাতে কন্যা ভাল মন্দ আহার করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করেন, কুমারী অবস্থায় সাধনার হৃষ্টপুষ্ট দেহ ছিল, বিবাহের পর দিন দিন কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে দুই দফা গর্ভিণী হইয়া তাঁহার শ্রীছাঁদ আর সেরূপ নাই, অলৌকিক রূপ কান্তি যেন ম্লানভাবাপন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণলালের বড় সাধ, কন্যার পূর্ব্ব ভাব দেখিয়া মনের আনন্দ লাভ করেন, এ কারণ সাধ-নার আহারের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

রমাকান্ত কন্যা পুত্রের পিতা হইয়াও স্বেচ্ছায় শ্বশুরালয়ে যাইতে পারেন না, বিনা নিমন্ত্রণে রমাকান্ত কখন শ্বশুরালয়ে যাইতেন না, তাহাতে সাধনা পিতৃভবনে কদাচিৎ আসিয়া থাকেন, এক্ষণে সুধারাম ভগ্নীপতির বাটীতে যাইয়া তাহাকে সময়ে সময়ে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। এখন রমাকান্ত প্রতি সপ্তাহে শনিবার রাত্রে শ্বশুর বাটীতে আহারাদি করেন,রমাকান্ত স্ত্রীর সদ্বুদ্ধি গুণে অনেকটা মতি গতির পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তথাচ শনিবার রাত্রে অভিনয় দর্শনচ্ছলে গৃহ হইতে বাহির হওয়া স্বভাব অদ্যাবধি তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই,শ্বশুর বাটীতে আহারাদি করিবে বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া রমাকান্ত স্থানান্তরে বিলাস ভোগে বহুক্ষণ ক্ষেপণ করিয়া অধিক

রাত্রে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়, কৃষ্ণলালের গৃহে দ্বারবান নাই যে, ডাক শুনিবামাত্র দরজা খুলিয়া দিবে, অতএব জামাতা অধিক রাত্রে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণলাল দ্বারোদ্ঘাটন করেন, কাহাকেও কোন কথা কহা কৃষ্ণলালের স্বভাব নহে, তাহাতে রমাকান্ত তাঁহার জামাতা, কতদিনের পর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে, যদি কোন কথা কহেন, আর তাঁহার কথা রক্ষা না হয়, এই ভয়ে তিনি কোন কথাই কহিতেন না। একদিন শনিবার রাত্রে রমাকান্ত শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল, আসিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইয়াছিল, কৃষ্ণলাল দরজা খুলিয়া দিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন, দ্বিতল গৃহে সাধনা কন্যা পুত্র লইয়া শয়ন করিয়াছিল, গৃহে একটীমাত্র প্রদীপ ক্ষীণ প্রভায় অন্ধকার নাশ করিতেছিল, রমাকান্ত সাধনার গৃহে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই একটী ঢাকন চাপা রহিয়াছে দেখিতে পাইল। সাধনা গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতা, গৃহ মধ্যে সাড়া শব্দ কিছুই নাই। রমাকান্ত এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া প্রদীপটির পলিতা সরাইয়া অপেক্ষাকৃত আলোকিত করিল। তাঁহার পদশব্দে সাধনার নিদ্রাভঙ্গ হইল, রমণী অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেও ?"

রমা। আমি।

সাধ। এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ? বাবা তোমার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শয়ন করিয়াছেন।

রমা। তিনিই আমাকে দরজা খুলিয়া দিয়াছেন, ঢাকন-ঢাকা কি আছে ?

সাধ। কেন ? দাদা ত তোমাকে এখানে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তুমি কি তাহা শুন

নাই, মা তোমার জন্য পাঁঠা এবং খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

রমা। এত রাত্রে আহার করিলে অসুখ করিবে, আমি কিছু খাইব না।

সাধ। দেখ, তোমার জন্য খাবার প্রস্তুত হইয়াছে, যদি তুমি কিছু না খাও, তাহা হইলে সকলেই দুঃখ করিবেন।

রমা। আমার ভাল মন্দ সকলই তোমার হাত, তুমি যাহা অন্যায় বিবেচনা কর, তাহা আমি করিতে প্রস্তুত নহি।

সাধ। সে কথায় আর কাজ কি, তাই তুমি রাত্রি দুইটার সময় এখানে আসিয়াছ। তুমি আমার কথা মত সকল কাজই কর কিনা। এখন আহার করিতে বস।

সাধনা শশব্যস্তে স্বামীর আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল এবং মৎস্যের কাঁটা গুলি বাছিয়া লুচির গ্রাস প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল। রমাকান্ত বাটী হইতে আহার করিয়া আইসে নাই বটে, কিন্তু জনৈক বন্ধুর সহিত উত্তমরূপ জলযোগ করিয়াছিল, এজন্য দুই এক খানি লুচি খাইয়াই সে মাংস খাইতে আরম্ভ করিল, কৃষ্ণলালের গৃহে পলাণ্ডু ভক্ষণ প্রচলিত নাই, রমাকান্তকে পলাণ্ডু ভক্ত জানিয়া মাংসে তাঁহার জন্য পলাণ্ডু দেওয়া হইয়াছিল, রমাকান্ত মাংসের আস্বাদন বিশেষ মুখপ্রিয় হইয়াছে বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত সাবাড় করিল, তৎপরে মুখ ধুইয়া তাম্বুল গ্রহণ করিয়া সাধনার সহিত একত্রে শায়িত হইল।

সাধনা রমাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাটীর সকলে ভাল আছেন?

রমা। ভাল বটে, কিন্তু শ্রীকান্তের জন্য বাবার সহিত আবার মনান্তর হইয়াছে।

সাধ। ছি ছি! তোমাকে এত বলি, তুমিত বুঝিবে না।

রমা। তা আমি কি করিব? আমিত কোন দোষ করি নাই, আমার সঙ্গে শ্রীকান্তের বাক্‌বিতণ্ডা হইতেছিল, তিনি কেন আমার উপর রাগিয়া উঠিলেন, অন্যায় কতকগুলি তিরস্কার করিলেন?

সাধ। বাবা না হয় দুটো কড়া কথা কহিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করা কি তোমার ভাল হইয়াছে?

রমা। ভালমন্দ বিবেচনা শক্তি ক্রোধের সূত্রপাতেই লোপ পাইয়া যায়।

সাধ। হঠাৎ কাহারও উপর রাগ প্রকাশ করিও না, এ কথা তোমায় আমি কতবার বলিয়াছি; কিন্তু তোমার স্বভাব দোষে কোন কথাই স্মরণ থাকে না, ভাল মনে যাহা ভাল বুঝ তাই কর, আমার হস্তারক হইবার অধিকার কি আছে?

রমা। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন ও সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কি হইবে? এবার আমার যে দোষ নাই, তাহা বোধ হয় বাবা নিজেই বুঝিয়াছেন।

সাধ। তোমার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র, যখন যাহা মনে আসিল অমনি করিয়া বসিলে, কিন্তু পরিণামের বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখ না। কবে আর সংসার ধর্ম্ম করিতে শিখিবে? এখন আর ছেলে মানুষী তোমার পক্ষে সাজে না।

রমা। ভবিষ্যতের বিষয় বাস্তবিকই আমি ভাবি না, লোকে আমাকে কতই কৃতীমান বলিয়া জানে; কিন্তু আমার অপেক্ষা অধম আর কে আছে?

সাধ। যদি আপনাকে এতই নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়

তবে লোকের উপর চড়িয়া উঠ কেন? সে সময় এ জ্ঞানত থাকে না।

রমা। তাইত সাধনা! তুমি বারে বারে আমায় বুঝা-ইয়া দাও, কিন্তু কার্য্যকালে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া থাকে, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

সাধ। প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবন! ভগবান করুন যেন তোমার এই প্রতাপ থাকিতে থাকিতেই আমার মৃত্যু হয়, আমি তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী, তোমার যদি এখনও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না, তাহা হইলে আমার আর বাঁচিয়া সুখ কি?

রমা। সাধনা! যথেষ্ট হইয়াছে, আমিই স্বীকার করি-তেছি, সংসার বন্ধনে ঘাত প্রতিঘাতে শ্রান্ত হৃদয়ের তুমিই একমাত্র শান্তিদায়িনী, আমায় ক্ষমা কর।

সা। দেখ, যাহারা এক সন্ধ্যা আহার করিয়া দিন কাটায়, তাহারাও সুখভোগী হইতে পারে। তোমার আয় যথেষ্ট না হইলেও তুমি নিজ দোষে কল্পিত অভাবে উদ্বিগ্ন হইতে থাক। তোমার সে বিষয়েই বা দৃষ্টি কোথায়?

রমা। তুমি যাহা বলিতেছ, এ কথাও সত্য বটে, কিন্তু আমি নিরুপায়। মনে ভাবি দশ টাকার সংস্থান করিব, আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিব, লোকের সহিত সদ্ভাব রাখিব, কার্য্যকালে তাহার বিপরীত হইয়া থাকে।

সা। ভাল, কেন এমন হয়? তোমার আত্মবল কোথায়? আত্মহারা হইয়া যখন যাহা মনে আসে, করিতে তৎপর হও, পরিণাম ফল—মনকষ্টে কালযাপন! টাকা লইয়া কেহ আসে নাই, যাইবেও না; তথাপি টাকায় এখন বন্ধু বান্ধব, টাকায় সংসার ধর্ম্ম। হাতে পয়সা না থাকিলে কোথাও আদর নাই।

কথায় কথায় উভয়েরই তন্দ্রালাভ হইল, শান্তিময়ী নিদ্রা-দেবী যুবক যুবতীকে ক্রোড়ে লইলেন, স্ত্রী পুরুষে দ্বন্দ ঘুচিয়া গেল। একে অধিক রাত্রি জাগরণ, তাহাতে বহু শ্রমের পর রমাকান্ত শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে লীন হইয়াছে, প্রভা-তের আলোকে জগৎ জাগ্রত হইলেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না; সাধনা উষাসতীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল।

জামাতাকে আহার করাইবার জন্ম সরলার একান্ত সাধ, গত রাত্রে রমাকান্তের আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তিনি আহার সামগ্রী যৎসামান্ত মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট সমস্তই পড়িয়া ছিল, তিনি সশব্যস্তে সুধারামকে ডাকাইয়া জামাতাকে সে দিবস তথায় অবস্থিতির জন্ম অনুরোধ করা-ইলেন। মাতার আদেশ মতে সুধারাম ভগ্নীপতির গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তখনও নিদ্রিত দেখিতে পাইল, রমাকান্তের নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া কিয়ৎক্ষণ তৎপার্শ্বে বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে রমাকান্ত জাগ্রত হইল, সে সম্মুখে সুধারামকে দেখিয়া সশব্যস্তে কুশল জিজ্ঞাসা করিল। গত রাত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, উভয়ে পরস্পর বাক্যালাপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে কথায় কথায় সুধা-রাম ভগ্নীপতিকে স্নানাহার কারণ অনুরোধ করিল, রমা-কান্ত প্রথমে আপত্তি উথাপন করিল বটে; কিন্তু মনোমধ্যে কি ভাবিয়া সে সে দিবস তথায় অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইল। যথাকালে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া রমাকান্ত সুধারাম সহ বৈঠকখানা গৃহে উপস্থিত হইল, গল্পালাপে সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। মধ্যাহ্ন আহারের বিষয়ে রমাকান্তের কোন অংশে ত্রুটি হইল না। কৃষ্ণলাল জামাতার স্বভাবচরিত্র

বিশেষ রূপ বুঝিতেন, একারণ তাহার সহিত বিশেষ সাবধানের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। আহারাদির পর সুধারাম ও রমাকান্ত বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া আছে, কৃষ্ণলাল আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি জামাতাকে লক্ষ্য করিয়া সুধারামকে বলিলেন, বসিয়া যে সময় গল্পালাপে নষ্ট করিতেছ, এ সময়ে একখানি পুস্তক পাঠ করিলেও অনেক উপকার হইতে পারে। দেখ আমোদ প্রমোদের বিস্তর সময় আছে, কিন্তু কাজের সময় তোমার ফুরাইয়া আসিতেছে; এ সময় ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলে; পরিণামে কষ্ট পাইতে হইবে। বুঝিয়া কাজ কর, হেলা করিয়া এ সময় নষ্ট করিলে সময়ে পরিতাপ করিতে হইবে।

সুধারাম পিতার কথা কয়েকটী সাগ্রহ চিত্তে শ্রবণ করিয়া তদ্দণ্ডে একখানি অঙ্কের পুস্তক ও খাতা লইয়া অঙ্ক কষিতে বসিল। রমাকান্ত তাহার অঙ্ক কষা দেখিতে লাগিল।

কৃষ্ণলাল রমাকান্তকে উপদেশচ্ছলে দুই একটী কথা কহিবার ইচ্ছাতেই বৈঠকখানা গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সহসা কোন কথায় পাছে জামাতা দূষ্য বিবেচনা করে, একারণ তিনি এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আর নীরব থাকিতে না পারিয়া রমাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজীউ কাজ কর্ম্ম কেমন হইতেছে?

রমা। আমাদের বাঁধা ধরা কাজ, উন্নতি বা অবনতি কিছুই নাই, একভাবেই চলিতেছে।

কৃষ্ণ। মাহিনা কিছু বৃদ্ধি হইল কি?

রমা। না, তবে বোধ হয় দুই এক মাস পরে টাকা পাঁচেক বাড়িতে পারে।

কৃষ্ণ। সময় বড় খারাপ পড়িয়াছে, আফিসে কাজ কর্ম্ম করা বড়ই গোলযোগ, কথায় কথায় সাহেবেরা জবাব দেয় জরিমানা করে।

রমা। সে ভাবনা আমাদের নাই।

কৃষ্ণ। গলদ হইলেই গোল হইতে পারে, বিশেষ সাবধানে কাজ কর্ম্ম করিবে। মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিতে বিশেষ চেষ্টা পাইবে।

শ্বশুরের কথায় রমাকান্তের মুখে যেন কিঞ্চিৎ বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইল, কৃষ্ণলাল সদুদ্দেশেই জামাতাকে এরূপ উপদেশ দিতে ছিলেন, কিন্তু রমাকান্তের তাহা মনোমত হয় নাই বুঝিয়া, তিনি আর কোন কথার উত্থাপন করিলেন না কিঞ্চিৎ ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তথা হইতে স্থানান্তরিত হইলেন।
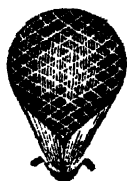
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রমাকান্ত যাহা বেতন পায় এবং সময়ে সময়ে অন্যান্য কাজ কর্ম্মে সে যাহা অতিরিক্ত উপার্জ্জন করে, তাহারও কতক অংশ সংসারের জন্য খরচ করে। তাহা ছাড়া রমাকান্তের মাসিক যাহা বাজে খরচ হিসাবে ব্যয় হয়, তজ্জন্য সময়ে সময়ে তাহাকে ঋণগ্রস্ত হইতেও হয়, সে বিষয়ে রমাকান্তের বিশেষ দৃষ্টি না থাকায় এক পয়সাও সঞ্চিত হয় না। শ্রীকান্ত এখনও কারবার করে, কিন্তু মূল ধনের অভাবে মনের কল্পনা মনেই থাকিয়া যায়, অথচ দুই দশ টাকা লোকের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য শ্রীকান্ত বিশেষ উদ্যোগী, সে নিজ হস্তেই সমস্ত কাজ কর্ম্ম দেখিয়া থাকে, সময়ে সময়ে বিশেষ উপায়ও করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসারের খরচ জন্য নির্দ্দিষ্ট আয় সমস্তই দিয়া থাকে, শ্রীকান্ত অপেক্ষাকৃত উপায়ক্ষম হইলেও সংসার খরচ হিসাবে পরিমিত ব্যয় করে, মায়াসুন্দরী জ্যেষ্ঠ-পুত্রাপেক্ষা মধ্যমকে খরচ পত্রের জন্য বিশেষ পীড়ন করেন না, তবে নিতান্ত অনাটন পড়িলে তাঁহাকে শ্রীকান্তের নিকটেও হাত পাতিতে হয়। জ্যেষ্ঠা-পেক্ষা শ্রীকান্তের লেখা পড়ায় হীনতা থাকিলেও শ্রীকান্তের

বিষয় বুদ্ধি রমাকান্তের অপেক্ষা উচ্চতর। শ্রীকান্তের নির্দ্ধারিত আয় নাই বটে, তথাপি, মাতার হস্তে মাসিক নির্দ্দিষ্ট টাকা প্রদানে কোন অংশে ত্রুটি করে না। শ্রীকান্ত অন্য কাজ কর্ম্মে নির্ভর না করায় অভিলাষ মত ব্যবসা চালাইতে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া থাকে। ব্রজেশ্বর পুত্রদিগের ভাল মন্দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না, তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তবে অন্যান্য পুত্রগণ এখনও বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে, তাহাদের ও পৌত্র গোপালের তত্ত্বাবধারণ স্বয়ং করিয়া থাকেন। যাহাতে বালকগণ লেখাপড়ায় যত্ন করে এ বিষয়ে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

শ্রীকান্ত ও রমাকান্তের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া মায়াসুন্দরী সংসারের খরচ পত্র চালাইতেছেন, সময়ে সময়ে যাহা অকুলান হয়, নিজেই বহন করিয়া থাকেন ; তাহা ছাড়া ব্রজেশ্বরের কোম্পানীর কাগজের সুদ হিসাবেও যে টাকা কড়ি আদায় হইয়া থাকে, তাহারও কতক অংশ গৃহিণী সংসার খরচ হিসাবে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। এখন সচ্ছলে এক প্রকারে ব্রজেশ্বরের পরিবারবর্গের দিনাতিপাত হয়, কিন্তু মায়া সুন্দরী বিশেষ সাবধানে সংসার চালাইলেও পুত্রকন্যা প্রভৃতি সকলকে তাদৃশ সুখী করিতে পারেন না।

ব্রজেশ্বর দুইটী পুত্রের বিবাহ দিয়া দুইটী পরের মেয়ে ঘরে আনিয়াছেন, দুইটীই দেখিতে সুন্দরী বটে, কিন্তু গুণের বিলক্ষণ তারতম্য আছে, জ্যেষ্ঠা সাধনা যে ভাবে দিন কাটাইতেছে, কনিষ্ঠা বিলাসিনীর সে ভাব নাই। সাধনার কেশ বিন্যাস বা অঙ্গ সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি নাই, কিন্তু বিলাসিনীর সে সকল না হইলে কেমন যেন অভাব বোধ হয়, সাধনা সমবয়স্কার সহিত গল্পালাপে বহুক্ষণ ক্ষেপণ করিতে বিরক্তি

বোধ করে, কিন্তু বিলাসিনীর তাহাতে আমোদ বৃদ্ধি হয়। সাধনা এতকাল শ্বশুরগৃহে বাস করিতেছে, তাহার মুখের সাড়া গৃহান্তর হইতে কদাচ কেহ শুনিতে পায় নাই, আর বিলাসিনীর চলন চালন ও গলার আওয়াজে বাটীর সকলকেই বিরক্ত হইতে হয়। উভয়েই গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম করে বটে ; কিন্তু সাধনার মত বিলাসিনীর কাজের বাঁধন নাই, যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া বোধ হয়।

রমাকান্তের বিধবা-ভগ্নীদ্বয় পিতৃ সংসারেই দিনাতিপাত করিতেছে, দিনেকের তরে তাহাদের স্থানান্তরে যাওয়া ঘটে না, উভয়েই স্বামী ধনে বঞ্চিতা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে সুখদা মোক্ষদা ব্রজেশ্বরের সংসার রক্ষা করিতেছে, অভাগিনী দ্বয়ের পরিশ্রমে বিরাম নাই ; তাহারা রন্ধন, পাঠ ঝাঁট, গৃহস্থালীর প্রায় যাবতীয় কার্য্যই করিয়া থাকে। তাহাদের উদ্বৃত্ত যে সকল কাজকর্ম্ম পড়িয়া থাকে, তাহাই বড় ও মেজ বৌকে করিতে হয়। মায়াসুন্দরী গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মে প্রায়ই সংলগ্ন থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে পয়সার ভাবনা ভাবিতে হয়, সংসারের ভাল মন্দ গুছাইতে হয়, বড় বৌ তাদৃশ কার্য্যতৎপরা না হইলেও যে কাজে হস্তক্ষেপ করে, তাহাতে কাহারও সাহায্য বা উপদেশের প্রয়োজন হয় না, নিজ বুদ্ধিবলেই সুচারু রূপে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে। মেজ বৌ কর্ম্মশীলা বটে, কিন্তু তাহার ভাল মন্দ বোধ নাই, হয়ত একটী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়া অন্য একটী অপকর্ম্ম করিয়া বসে, এ কারণ তাহাকে সময়ে সময়ে ননন্দিনী দ্বয়ের গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। সাধনা আপনাকে শক্তিহীনা অকর্ম্মণ্যা বলিয়াই জানে, শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামী ব্যতীত সকলেই তাহার বয়োকনিষ্ঠ ও স্নেহের পাত্র, অন্যে কেহ কোন কর্ম্ম

কহিলে তাহার প্রত্যুত্তর দিবার বা কোন কথা বলিবার তাহার অধিকার আছে; কিন্তু সে সতত সশঙ্কিত ও সলজ্জ ভাবে কাল যাপন করে। বিলাসিনীর সে লজ্জা ভয় কিছুই নাই, পদে পদে অপকর্ম্মের জন্য তিরস্কৃতা ও লাঞ্ছিতা হইলেও কার্য্য-কালে তাহার সে কথা কিছু স্মরণ থাকে না, যে জন্য অপ-দস্থা হইয়াছে, পরক্ষণে তাহাই করিয়া বসে। দেবরগণ সাধ-নাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, এক দিনের জন্য তাহাদের সহিত তাহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয় না, কেহ কোন দোষের জন্য তিরস্কৃত হইলে সাধনা তাহাকে কোলে টানিয়া লয়, প্রবোধ বাক্যে সুমিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করে; কিন্তু মধ্যম বধূর হৃদয়ে সে ভাবের বিকাশ নাই হয়ত দেবর দিগে-রই সহিত তাহার কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়।

রমাকান্ত যাহা উপায় করে, তাহাতে সকল দিক সঙ্কুলান হয় না; শ্রীকান্তের সময় ভাল পড়িয়াছে বটে; কিন্তু তাহারও নিজ খরচায় অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যায়, তাহাতে সে যে ব্যবসা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, টাকা সংস্থান হইতে না হইতে ব্যয় হইয়া যায়। ব্রজেশ্বর এক্ষণে শ্রীকান্তের কার্য্যাদির হিসাব পত্র রাখেন।

বহু পরিবার যুক্ত সংসারের কাজ কর্ম্ম শেষ করিতে ব্রজে-শ্বরের বিধবা কন্যাদিগের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়, ঈশ্বর তাহাদিগকে বিধবা করিয়াছেন, অথচ পিতার সংসারে কাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় তাহারা পতি পুত্র হীনা হইয়াও মনের আনন্দেই অন্য মনস্কে কালক্ষেপ করে।

রমাকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমেশচন্দ্র এক্ষণে বঙ্গ-বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে, বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিয়া নবমে পদার্পণ করিয়াছে। সাধনার সাধ আহ্লাদ এ সংসারে

কিছুই নাই, সন্তানদের বেশ বিন্যাসে কিন্তু তাহার একান্ত অনুরাগ, সে বালকবালিকাকে বেশ ভূষায় সুসজ্জিত রাখিবার জন্য সদা সর্ব্বদাই যত্নবতী। কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত পরিধেয় বস্ত্রাদির জন্য সময়ে সময়ে কষ্ট পাইতে হয়, ইহাতে সাধনার প্রাণে আঘাত লাগে, সে নিজ সঞ্চিত অর্থে তাহাদের আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি যোগাইয়া থাকে, এজন্য পতির সহিত সাধনার কথান্তর হয়; কিন্তু রমাকান্তের প্রকৃতির সহিত সাধনার চরিত্রের অমিল নাই, যুবতী অকারণ বাক্যব্যয় করিয়া ক্ষান্ত হন।

রমাকান্ত সংসারের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়াও স্বভাব দোষে পরিজনবর্গের বিরক্তি ভাজন হইয়া থাকে, এ কারণ অন্যের মনে কষ্ট হয় না বটে; কিন্তু তাহাতে একমাত্র সাধনার হৃদয় ব্যথিত হয়, তিনি পতির সুমতির জন্য সাধ্যাসাধনার কোন অংশে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু কার্য্য-কালে স্বামী তাহার বিপরীত ব্যবহার দেখাইয়া থাকে।

সাংসারিক ঘটনা সূত্রে এক দিবস সাধনা মর্ম্মাহতা হইয়া নিজ গৃহে পুত্র কন্যা লইয়া রজনীর নির্জ্জনতায় আপন মনে নেত্রবারি বর্ষণ করিতেছে, বাটীর অন্যান্য পরিজনবর্গ সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে, কেবল মাত্র রমাকান্ত এখনও বাটীতে প্রত্যাগমন করে নাই, সে আমোদ প্রমোদে মাতিয়া স্থানান্তরে কালযাপন করিতেছে। অভাগিনী সাধনা মনের দুঃখ মনেই রাখে, বাটীর পরিজন বর্গের নিকট হৃদয় দ্বার উদঘাটিত করিয়া কদাচ কোন কথার উল্লেখ করে না, সে এরূপ ভাবে শ্বাশুড়ী ননদিনী বা দেবরাদির সহিত কথাবার্ত্তা কহে যে, তাহাতে তাহার মনোব্যথা প্রকাশ পায় না, কিন্তু আজ মানসিক যন্ত্রণা তাহার অসহ্য হইয়াছে, সে মনের দুঃখ মনেই লীন করিতে না পারিয়া নিরালয়ে নীরবে রোদন করিতেছে,

কত ভাবনা চিন্তা তাহার মনে উঠিতেছে ও লোপ পাইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সে এতই অধীরা হইয়াছে যে, জীবন ধারণ তাহার পক্ষে বিষম ভার বোধ হইয়াছে; কি করিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, আপন মনে চিন্তা সাগরে ভাসিতেছে, একমাত্র জগৎচিন্তামণি জগদীশ্বরের নাম লইতেছে, এমন সময়ে রমাকান্ত বহির্দ্বার উদ্ঘাটন জন্য ডাক দিল, সকলেই নিদ্রিত, কে সেই নিশাচর রমাকান্তকে উত্তর দিবে? সাধনা চিন্তা সমুদ্রে নিমগ্না থাকিলেও স্বামীর কণ্ঠস্বরে আলোক হস্তে গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া বহির্দ্বার উদ্ঘাটন জন্য সশব্যস্তে অগ্রসর হইল, একাকিনী রমণী বহির্দ্বার দেশে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বিতল হইতে পথের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণে বুঝিতে পারিল প্রকৃতই পতি বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে, সদর দরজা খুলিবা মাত্র রমাকান্ত জড়সড় ভাবে বাটীতে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং দ্বার রুদ্ধ করিল এবং সহধর্ম্মিণীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্বিতল গৃহে শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট হইল, গৃহ দ্বার রুদ্ধ হইল। রমাকান্ত কাপড় ছাড়িবার কালে জনৈক বন্ধুর অনুরোধে বাটী আসিতে অধিক রাত্রি হইয়াছে, এইরূপ ছলনা করিল, পরক্ষণে সাধনার মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সে প্রণয়িণীর বিষণ্ণ বদন দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে, সাধনা এত রাত্রি রোদন করিয়াছে, তাহার মুখে প্রফুল্লতার লেশ মাত্র নাই। সতীর একমাত্র সোহাগের সামগ্রী পতি, রমাকান্ত রমণী-মণি সাধনার পাণিগ্রহণ করিয়া পদে পদেই পতি-প্রাণাকে অসুখী করিতেছে, একদিনের জন্যও তাহাকে সুখী করিতে পারে নাই। মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত মুখ ম্লান করিয়া সাধনারে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এত রাত্রি জাগিয়া রহিয়াছ

কেন ?" সাধনা স্বামাকে দেবতা বলিয়াই জানিত, রমাকান্ত তাহাকে চিরদিন অসুখী রাখিয়াছে বটে ; কিন্তু সাধনা স্বামীর চিত্ত বিনোদনে কোন অংশে ক্রটী করিত না, রমাকান্ত যে কৃত্রিম বিষন্ন ভাব দেখাইয়া তাহাকে এরূপ প্রশ্ন করিল, তাহা তাহার অজ্ঞাত রহিল না, তথাচ পতির কথায় সে উত্তর করিল "আমার নিদ্রা হয় নাই।"

রমা। কেন ? অন্য দিন ত তুমি ঘুমাইয়া পড়।

সা। সব দিন কি মনের ভাব সমান থাকে !

রমাকান্ত বুঝিল, সাধনা চিন্তায় নিমগ্না থাকায় নিদ্রাদেবী তাহাকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন নাই, তাহাতে প্রণয়িনীর গণ্ডস্থলে অশ্রু ধারার পূর্ণ লক্ষণ বিরাজমান রহিয়াছে, সে কহিল, "মানুষের দিন সমান যায় না বটে, কিন্তু রাত্রিকালে সকলেই নিদ্রার ঘোরে নিশ্চিন্ত থাকে।"

সা। তোমার মত যদি আমি জ্ঞানী হইতাম, তাহা হইলে হয়ত এতক্ষণ নিদ্রিত থাকিতাম, কিন্তু সে জ্ঞান আমার এখনও হয় নাই।

রমা। তুমি বড় রসিকা হইয়াছ, যাহা হউক তোমার কথা শুনিয়া আজ আমার মনে আনন্দ হইল।

সা। আমোদ প্রমোদ যাহার চির-সঙ্গি, তাহার আবার আমার কথায় কি আনন্দ হইবে ?' আমার যদি সেই শক্তিই থাকিবে, তাহা হইলে আমিই বা ভাবিয়া মরি কেন, তোমাকেই বা এত বুঝাইয়া ফিরাইতে পারিলাম না কেন ?

রমাকান্ত ভাবিল, আজ যুবতী কোন কারণে বিশেষ মনোব্যথা পাইয়াছে, তাহাতে আমার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাহার মন অধিকতর কাতর হইয়াছে, সে আর কোন কথা না কহিয়া এককালে যুবতীর করদ্বয় গ্রহণ করিল। সাধনা বিনয়

নম্র বচনে উত্তর করিল, আমার হাত ছাড়িয়া দাও, তুমি আমাকে অনুনয় বিনয় করিতেছ কেন? তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই কর, আমি সে পথের কণ্টক হইতে ইচ্ছা করি না, তোমার সুখেই আমার সুখ, আমি তোমাকে সুখী রাখিলেই স্বর্গীয় সুখ লাভ করি।

রমা। তুমি আমার সুখে সুখী হও বটে; কিন্তু আমি তোমাকে সুখে রাখিতে এক দিনের জন্যও যত্ন করি নাই. আমার জন্য তুমি দিবা রাত্রি মনোকষ্টে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে থাক, আমি তাহা সকলই বুঝিতে পারি, তবে আমার সঙ্গে এ ছলনা কেন? তোমার পক্ষে এ ভাব আমার বড় কষ্টকর। আর তোমায় অসুখী করিব না, আজ আমায় ক্ষমা কর। সকল দোষ ভুলিয়া যাও।

না। আমার নিকটে তোমার অনুনয় বিনয়ের কোন প্রয়োজন নাই, আমি তোমার দাসী মাত্র, তুমি আমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, তোমার কার্য্যে আমার বাধারক হইবার কোন অধিকার নাই। ঈশ্বর করুন, যেন আমার জন্য ক্ষণেকের নিমিত্তও তুমি প্রাণে ব্যথা না পাও।

রমা। তুমি আমায় ভালবাস, তাই এই ভাব, কিন্তু স্বভাবদোষে আমি তোমার মর্য্যাদা রাখিতে পারি না, উহাই দুঃখ, আমার কারণ তুমি অনেক বিষয়ে মনে ব্যথা পাও, আর আমি তোমার মনোকষ্টের কারণ হইব না।

না। সুখ দুঃখ সকলই ঈশ্বরের হাত, সে বিষয়ে তোমার আমার অধিকার বা অপরাধ কি? তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে, পূর্ব্ব জন্মে যে সকল পাপ কার্য্য করিয়াছি, এখন তাহার ফল ভোগ করিতেছি, ভগবানের নিয়মের ব্যতিক্রমে কোন কার্য্য করিবার কাহারও অধিকার নাই।

রমা। সাধনা! তুমি সতী সাবিত্রী পতিব্রতা, তোমার এ সংসারে কষ্ট পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমিই তোমার সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছি, আমিই তোমার শান্তির কাল স্বরূপ হইয়াছি, আমার অপেক্ষা এ পৃথিবীতে নরাধম আর কে আছে!

সা। দেখ, অকারণ আত্মগ্লানির প্রয়োজন নাই, আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোমার সুখে আমার সুখ, তবে তুমি এরূপ ভাব প্রকাশে আমায় অসুখী করিতেছ কেন? মিনতি করি তুমি ব্যথিত হইও না।

সাধনা স্বামীকে যে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, রমাকান্তের তাহা অবিদিত ছিল না, সে স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বিশেষ সযত্ন হইল, উত্থাপিত কথার প্রসঙ্গ এককালে ক্ষান্ত দিল। উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি তাকাইয়া ক্ষণেকের মধ্যে আনন্দ সাগরে ভাসিল। সাধনা এতক্ষণ ধরিয়া যে মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিল, স্বামীর প্রফুল্লমুখ দেখিয়া সে সকল কিছুই আর তাহার স্মরণ রহিল না, সাধনার ভাব গতি দেখিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা রমাকান্ত তাহাকে দৃঢ় রূপে আলিঙ্গন করিল। যুবক যুবতী ক্ষণেকের জন্য আনন্দ সাগরে ভাসিল। সাধনারও রমাকান্তের হাব ভাবে বিষাদের লক্ষণ দূর হইয়া গেল।

রমাকান্ত বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদে মাতিয়া সুদীর্ঘ কাল শান্তিময়ী রজনীর শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিল, অভাগিনী সাধনাও মনের দুঃখে এতক্ষণ কাঁদিয়া কাটাইয়াছিল, কিন্তু দুই প্রকারে একত্র মিলিত হইয়া উভয়ে [illegible] বিকার চিত্তে নির্ব্বিকারের আভাস প্রতিফলিত হইল। [illegible] দেবী আসিয়া অশান্তির লোপ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরিসীম পরিশ্রমে ও মনের দুঃখে কষ্টে অশান্তিতে সাধনার দেহ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, সাধনার শরীরে রোগ প্রবেশ করিয়াছে; প্রায় ছয় সাত মাস ধরিয়া যুবতীর ক্ষুধা তৃষ্ণায় অনুরাগ নাই, সোণার অঙ্গে কালিমা পড়িয়াছে, সুগোল গঠন জীর্ণ-শীর্ণ অস্থি চর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বের সে শ্রীছাঁদ আর কিছুই নাই। সহসা যুবতীর মুখের প্রতি তাকাইলে তাহাকে কেহই চিনিতে পারে না। কেন তাহার এরূপ বিকৃতি হইতেছে। সকলেই তাহার কারণ জানিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু সাধনা নিজের অসুখের কথা অধিক কি স্বামীর নিকটেও অপ্রকাশ রাখিয়াছে, একে শারীরিক অসুস্থতা, তাহাতে সাংসারিক ঘটনাচক্রে মনের সন্তোষ লাভে এককালে বঞ্চিতা হইয়া সাধনার ইহজীবনের প্রতি বীতানুরাগ জন্মিয়াছে।

পুত্র কন্যার জননী হইয়া সাধের সংসার পাতিয়া সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন কামনা এক সময়ে সাধনার হৃদয়ক্ষেত্রে বিরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার চিত্ত হইতে সে ভাবের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। সে দিন দিন শারীরিক রোগে কাতরা

হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এক কালে যমজ সন্তান প্রসব করায় সে তাহার জীবনের সকল আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়াছে। পরিবারবর্গ তাহার যে উত্তরোত্তর শোচনীয় অবস্থা দাড়াইতেছে এ বিষয় অবগত হইয়াছে, সাধনার গুণে অনেকেই মুগ্ধ, অনেকেরই ইচ্ছা যুবতী নীরোগ নির্ব্ব্যাধি দেহে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন করে, কিন্তু বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন।

"যতই দিন শেষ হইতে লাগিল সাধনার অসুখ ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লোকের নিকট লজ্জা অপবাদ ও অপকলঙ্ক ভয়ে সাধনা অসুখের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই, অতি সাবধানে থাকিয়া গোপন রাখিয়াছে, কিন্তু রোগের যন্ত্রণা সময়ে অধিকতর কষ্ট দায়ক হইলে সে আর তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিল না, শ্বশুর বাটীর স্ত্রীমহলে এ কথা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, বাটীর গৃহিনী বধূর অসুখের কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র গৃহস্বামীকে সবিশেষ জানাইলেন। শ্বশুর সাধনার পীড়ার শান্তির কারণ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করিতেছেন শুনিবা মাত্র ভয়ে ও লজ্জায় সাধনা এককালে জড় সড় ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আসিয়া রোগের সবিশেষ কারণ ও স্থিতিকাল জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, প্রদর রোগ, যথাসময়ে প্রতীকারের কোন বন্দোবস্ত হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রদত্ত ঔষধি ও পথ্য রোগীর ব্যবস্থা হইল। সাধনা যেরূপ সদ্‌গুণ সম্পন্না ও বুদ্ধিমতী রমণী, তাহাতে তাহার শরীরের উপর আদর যত্ন থাকিলে সে স্বল্প কাল মধ্যেই অনায়াসে রোগ মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহজীবনে তাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে, সে যে কোন উপায়ে হউক নিজ প্রাণ

বিসর্জ্জন দিতে পারিলেই আপনাকে যেন কৃতার্থ জ্ঞান করে। সংসারে বাঁচিয়া সাধ আহ্লাদ করিতে আর তাহার তিলার্দ্ধ ইচ্ছা নাই। তাহার গুণে সকলে বিমোহিত হইলেও যেন কেমন এক ভাবে তাহার সহিত তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, সে ব্যবহারে সাধনার তৃপ্তি লাভ হয় না, অধিকন্তু মনোকষ্ট বাড়িতে থাকে।

ব্রজেশ্বর রমাকান্তকে সময়ে সময়ে অকারণ তিরস্কার করেন, মনোকষ্ট দেন, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে রমাকান্তের আয় দিন দিন বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক এক কালে হ্রাস হইয়া যাওয়ায় অভাগা চিন্তা-সাগরে ভাসিত, কিন্তু কত দিনে ভগবান যে তাহার প্রতি কৃপা দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, এদিকে সাধনার অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিল। বহুকালের পর পীড়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। রোগের সূত্রপাতে যথাযথ চিকিৎসা হইলে কথঞ্চিৎ উপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এক্ষণে পীড়ার সম্যক্ বৃদ্ধি হইয়াছে, ডাক্তার কবিরাজগণ ক্রমাগত ঔষধ পত্রাদির পুনঃ পুনঃ ব্যবস্থা করিয়াও রোগের কিছুমাত্র উপশম করিতে পারিলেন না। সাধনা যে সঙ্কট অবস্থায় উপনীতা হইয়াছে, তাহা তাহার আত্মীয় স্বজন কাহারও অবিদিত রহিল না।

রমাকান্তের একমাত্র আশা ভরসা সকলই সাধনা, যুবক যুবতীকে একমাত্র সহায় ভাবিয়া সংসারের কোন কাজ কর্ম্মেই ভ্রূক্ষেপ করিত না; সাধনা তাহার গৃহলক্ষ্মী; সে নিজের ইচ্ছামতে যাহা ইচ্ছা করিয়া বেড়ায়, সকল দিক বজায় রাখিতে একমাত্র সাধনা, সাধনা বলেই সে সংসারে বলী; যাহা কিছু করে, কদাচ পরিণামের প্রতি ভাবিয়া দেখে না, সে সমস্ত ভার সাধনার স্কন্ধে পড়িয়া থাকে। পতির

মঙ্গল কামনা ব্যতীত সাধনার জীবনে অন্য উদ্দেশ্য নাই। রমাকান্ত সাধনাকে প্রকৃতই হৃদয়ের সহিত ভালবাসিত, সাধনা ইহ জীবনে সেই সুখেই সুখী, কি প্রকারে রমাকান্ত সুখে থাকে, কোন বিষয়ে তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, এই সকল লইয়াই সদা সর্ব্বদা ভাবিত ও ব্যস্ত থাকিত, অথচ সংসার ধর্ম্মের কাজ কর্ম্ম এরূপ সুন্দর ও সুপ্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহ করিত যে, কেহ তাহার হৃদয় ভাব পর্য্যন্ত জানিতে পারিত না, দিনে দিনে যখন তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া আসিল, পীড়ার দারুণ যাতনায় অহোরাত্র কষ্ট ভোগ করিতেছে, আহারাদিতে এককালে অরুচি দাঁড়াইয়াছে, তখন সে এককালে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইল। ক্রমে তাহার উত্থান শক্তি রহিত হইয়া আসিল, এখন কেহ বসাইয়া দিলে বসিতে পারে। উৎকট ব্যাধির বিষম যন্ত্রণা বহুকাল সহ্য করিয়া লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেও তাহার অনিচ্ছা জন্মিয়াছে, দুই একটী কথা কহিলেই বমনোদ্বেগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় শ্বশুর গৃহে দিন যাপন করা তাহার মত লজ্জাশীলা সুধীরা রমণীর পক্ষে বড়ই কষ্টের বিষয়; কিন্তু সাধনা বিশেষ সাবধানে অতি-কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। যতই দিন শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, উত্তরোত্তর যুবতীর ততই অন্তিম সময়ের শোচনীয় ভাব দেখা দিল, পরিবারবর্গ সাধনার জীবন সঙ্কট ভাবিয়া সকলেই নির্জ্জনে দুঃখ করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যার তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান বিকাশ হয় নাই, তথাচ গর্ভধারিণীকে রুগ্ন শয্যায় এককালে শায়িতা ও উত্থানশক্তি রহিত দেখিয়া তাহারাও কতকটা বিচলিত ভাবাপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে অন্য পরিবার সহ বালক বালিকাও বিমর্ষ হইল, দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে এরূপ বিষণ্ণ ভাবাপন্ন

দেখিয়া বাটীর সকলেই তাহাদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। যমজ সন্তানদিগের হিতাহিত বিবেচনা শক্তির তখনও সূত্রপাত হয় নাই, সাধনার ইহ জীবনে ধিক্কার দিয়া অনন্ত জীবনে জীবন মিলাইবার আর বিলম্ব নাই, মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীরা হইয়া সে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছে, মাতার সে যন্ত্রণায় তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই; তাহারা স্তনপান করিবার জন্য তখনও উভয়ে উভয় পার্শ্বে ইতস্ততঃ করিতেছে, শাশুড়ী ননদিনী শ্বশুর দেবর সকলেই সাধনার যথাযথ পীড়ার প্রতীকারের জন্য সচেষ্টিত হইয়াছিলেন, যখন দেখিলেন যে, চিকিৎসকদিগের সাধ্যে সাধনার অসুখের কিছুই উপশম হইল না, তখন যুবতীর মৃত্যু অবধারিত জানিয়া সকলেই বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সাধনা যে ভাবে সংসারে দিন যাপন করিয়াছে তাহাতে তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার দোষারোপ করিবার কাহারও কোন কথা নাই। সে সকলকেই সদ্ভাবে শ্রদ্ধাভক্তি ও স্নেহ-চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ভাবের কখন ভাবান্তর হয় নাই। বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিল, তাহাতে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার নিন্দা করিবার কিছুই নাই।

সাধনার যতই পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পরিবারবর্গ সকলেই তাহার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে জানিয়া মনোক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিলেন। বিধাতার ভবিতব্য খণ্ডিত হইবার নহে, তিনি যাহার অদৃষ্টে যখন যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবার নহে। জীবনবায়ু শেষ হইয়া আসিতেছে, সাধনা সংসার ধর্ম্মের নিকট চির দিনের মত বিদায় লইয়া ইহ জীবনের লীলা সাঙ্গ করিতে বসিয়াছে, তথাচ কাহাকেও উপযুক্ত মান্যদানে তখনও তাহার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য

বা ব্যতিক্রম হয় নাই। উত্থানশক্তি এককালে রহিত হইয়াছে, তথাচ লজ্জাশীলা পরিধেয় বস্ত্রখানি যথাস্থানে সংরক্ষণে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছে না। রমাকান্ত সহধর্ম্মিণীর অন্তিমকাল উপস্থিত জানিতে পারিয়াছে, যে অবলম্বনে সে সংসারী হইয়া এতদিন দুঃখে কষ্টেও মেঘে বিজলীর মত মনের সুখে কালক্ষেপ করিতেছিল, বিধাতা তাহাকে সে আশ্রয় অবলম্বনে বঞ্চিত করিতে বসিয়াছেন। রমাকান্ত ভবিষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নাসারে ভাসিতে লাগিল। সাধনা তাহার পার্শ্বদেশেই শয়ন করিয়াছিল, অশ্রুধারায় স্বামীর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সকাতরে বলিল, আমার এ সময়ে তোমার চক্ষে জল দেখিলে বড় ব্যথা লাগে, আমি তোমার হাসি দেখিয়া সুখী হই, আমার সাধ্য নাই যে তোমার পাদপদ্মে মিনতি জানাইয়া কাঁদিতে নিষেধ করি, আমি তোমার সুখে সুখী, এ সময়ে চক্ষের জল ফেলিয়া আর আমাকে অসুখী করিও না।

সাধনার কাতরোক্তিতে রমাকান্ত কোঁচার খুঁট দিয়া নয়নদ্বয় মুছিল, কিন্তু একধারা শোষিত হইতে না হইতে অপর ধারা বহির্গত হইতে লাগিল, সাধনা যাহাতে মনে কষ্ট পায়, রমাকান্তের প্রাণে তাহা সহ্য হইবে কেন? সে ধৈর্য্য সহকারে এককালে অশ্রুধারা সম্বরণ করিয়া বলিল "সাধনা! এই দেখ আর আমার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বাহির হইতেছে না, আর আমার কোন অসুখ নাই, এখন আমাকে সুস্থ দেখিয়া তুমি সুস্থির হও, আর আমি তোমায় অসুখী করিব না।"

সাধনা। নাথ! আমায় আশীর্ব্বাদ কর, শীঘ্র যেন এ ব্যাধির কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই। তুমি স্বামী, আমার পরম গুরু, ইহ জগতের ইষ্ট দেবতা, তুমি আমার

প্রতি প্রসন্ন থাকিলে আমায় মৃত্যু যন্ত্রণাতেও কাতর করিতে পারিবে না। তোমার আশীর্ব্বাদই আমার এখন আশা ভরসা, শান্তির উপায়, আমি যেরূপ অন্তর্জ্জালায় জ্বলিতেছি, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন, ঈশ্বরের নাম লইতে আর আমার বল নাই, এ চরম সময়ে তুমি আমার সহায় হও। পূর্ব্ব জন্মে বহু পাপ করিয়াছিলাম তাই আমাকে ভগবান এই কঠিন ব্যাধি গ্রস্ত করিয়াছেন, তুমি আমার বল, তুমিই আমার একমাত্র সহায়; এখন যাহাতে এ ভীষণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি, শান্তি পাই, তাহার উপায় কর। আর আমার অধিক কথা কহিতে শক্তি নাই, কত কথাই মনে আসে, কিন্তু শরীর এমনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, জিহ্বার এরূপ জড়তা জন্মিয়াছে যে, আমার কথা কহিতেও শক্তি যোগাইতেছে না, মন যেন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তৃষ্ণায় জিহ্বা শুকাইয়া গিয়াছে। একটু জল দাও।

রমাকান্ত শয্যা পার্শ্বস্থ জলপাত্র হইতে প্রণয়িনীর মুখে এক চামচ জল ঢালিয়া দিল, সাধনার যে অন্তিম সময় সন্নিকট হইয়াছে রমাকান্তেরও সে বোধ জন্মিয়াছে। সে প্রিয়তমার মুখের প্রতি আর তাকাইতে পারিল না, তাহার নয়ন জলে সাধনার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সতী সাধ্বী মৃত্যু শয্যায় শায়িতা হইয়াও পতির প্রাণ যাহাতে ব্যথিত না হয় এখনও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে। অভাগা রমাকান্ত সাধনার শেষ অঙ্কের প্রতি যতই লক্ষ্য করিতে লাগিল, একে একে পূর্ব্ব স্মৃতি সকল তাহার মানস ক্ষেত্রে বিরাজিত হইতে লাগিল। সে প্রিয়ার শোচনীয় অবস্থা আর দেখিতে পারিল না, সাধনার অজ্ঞাতসারে নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রমাকান্তের সহিত সময়ে সময়ে ব্রজেশ্বরের মনান্তর হইলেও সাধনার চরিত্র গুণে তিনি বধূমাতাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তথাপি পতির অবিমৃষ্যকারিতার জন্য গুণবতী সাধনাকেও তিন চারি ক্ষেপ শ্বাশুড়ীর ক্রোধাগ্নিতে পতিতা হইতে হইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে যুবতী কোন দোষেরই দোষী নহে। কিন্তু গুরুজন অকারণ তাহার প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিলে সে মস্তক পাতিয়া সমস্ত লাঞ্ছনাই সহ্য করিত, দোষ গুণের জন্যও তাঁহাদের কথায় কখন কোন দ্বিরুক্তি করিত না। সময়ে সুবিধা মতে সমবয়স্কা ননদিনীর নিকটে পিতা বা মাতা তাহাকে অকারণ তিরস্কার করিয়াছেন জানাইত বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই দর্শিত না। ব্রজেশ্বর বা মায়াসুন্দরী বধূমাতার গুণের পরিচয় সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিলেন, তথাচ তাহার প্রতি বিশেষ তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন, তাহাতেও সাধনা এক দিনের জন্য কোন প্রকার বিরক্তিভাব প্রকাশ করে নাই। সাধনার পীড়ার সূত্রপাত হইতেই শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছিলেন, যথাসময়ে পথ্যাদির যাহাতে সুবিধা হয়, উভয়ে তদ্বিষয়ে কোন প্রকার উপেক্ষা করিতেন না, তাহাতে সাধনার বিনয়-নম্রতা গুণে ননদিনী ও দেবরগণ সকলেই মুগ্ধ, তাহার মুখের কথা বহির্গত হইতে না হইতে তাহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে। শয্যাগতা হইয়াও সাধনা, পরিধেয় বস্ত্রাদি, পথ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী স্বয়ং গুছাইয়া লইত; কিন্তু শরীর একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে উত্থানশক্তিরহিত হইলে শ্বাশুড়ী ননদিনী সকলেই প্রসন্নচিত্তে তাহার পরিচর্য্যা করিতেন। যত দিন শেষ হইতে লাগিল, সাধনার পীড়ারও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বিচক্ষণ ব্রজেশ্বর পূর্ব্ব হইতেই বধূমাতার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন,

তথাচ যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা ভাবিয়া চিকিৎসা পত্রের বন্দোবস্ত বিষয়ে স্বয়ং উদ্যোগী ছিলেন। তিনি দুই এক বার অকারণ সাধনাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধনার গুণে তিনি মোহিত ছিলেন, সাধনা তাঁহার কুললক্ষ্মী, সংসারের শোভা, এখন সেই সকল কথা তাঁহার মনোমধ্যে বিকাশ পাইতে লাগিল, তিনি সদা সর্ব্বদাই বধূমাতার তত্ত্বগ্রহণে তৎপর থাকিলেন।

রমাকান্ত চরিত্রহীন যুবক হইলেও সাধনাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, স্ত্রীর পীড়ার সূত্রপাতেই সে যথাকালে চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সাধনা কোন ক্রমেই তাহার কথায় সম্মতি প্রদান করে নাই। যখন রোগের প্রকোপ সাধনার অসহ্য হইল, তখন সে আর পরিবারবর্গের নিকট তাহা গোপন রাখিতে পারে নাই। সেই সময়ে রমা কান্ত সাধ্যমত চিকিৎসাদি ব্যবস্থা করে এবং ব্রজেশ্বরও এবিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন।

বিধাতা যখন যাহার অদৃষ্টে যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্যের সাধ্য সাধনায় তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবার নহে। সাধনা অল্প পরমায়ু লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ঐহিক ভোগের সময় অতি অল্পই ছিল; পিতৃ গৃহ বা শ্বশুরালয়ে সকলেই তাহার গুণে মুগ্ধ হইত, ব্রজেশ্বর বধূমাতার অসুস্থতার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিতেছিলেন, রমাকান্ত বয়োপ্রাপ্ত হইলেও বিষয় বুদ্ধিতে তাদৃশ পরিপক্ক হয় নাই, এ সময়ে তাহার গৃহশূন্য হইলে হয়ত অধিকতর অমঙ্গল ঘটিতে পারে, গৃহস্বামী এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। সাধনার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, বর্ষ হইতে মাস, মাস হইতে সপ্তাহ, সপ্তাহ

হইতে দিনে, দিন হইতে ঘণ্টায় তাহার জীবন সীমাবদ্ধ হইয়াছে। ব্রজেশ্বরের দিব্য নাড়ীজ্ঞান ছিল, তিনি সময়ে সময়ে সাধনার হস্তখানি লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন, যত ঘন ঘন নাড়ী দেখিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর তাঁহার মুখভাব মলিন হইয়া আসিল, তিনি প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ও সংসার ধর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও সাধনার এ অন্তিম সময়ে নয়নজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সকলেই গৃহস্বামীর মুখের প্রতি তাকাইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ছিল, সাধনার যে আর এককালে শেষ হইয়া আসিয়াছে, এ সংবাদের বিন্দু মাত্রও তাহারা জানিতে পারে নাই। ব্রজেশ্বর রমাকান্তের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে নয়নাসারে সিক্ত হইয়া স্বীয় শয্যাগৃহে যাইতেছিলেন, মায়াসুন্দরী শশব্যস্তে তাঁহার বধূমাতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রজেশ্বর সহধর্ম্মিণীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না, গৃহিণীর নিকট পতির মনোভাব অব্যক্ত রহিল না, তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া বধূমাতার অমঙ্গল জানিয়া বিকট শব্দে রোদন করিয়া উঠিলেন, বাটীর অন্যান্য পরিবারবর্গও তদ্দণ্ডে তাঁহার রোদনে যোগ দিল। ব্রজেশ্বরের বাটী বিলাপধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই সাধনার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল, কথা কহিবার আর শক্তি ছিলনা, নয়ন যুগল হইতে মুক্তবিন্দু ধারে বারিধারা নিপতিত হইতেছিল, সে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতে ছিল কিনা, হাবভাবে সে তাহার কিছু মাত্র বিকাশ পায় নাই। রমাকান্ত কর্ম্মস্থানে গিয়াছিল, বাটী হইতে সংবাদ আসিবামাত্র সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটী পৌছিল, সৌভাগ্য বশতঃ তখনও সাধনার প্রাণ-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর হইতে বিমুক্ত হয় নাই। সাধনা স্বামীর মুখের প্রতি ক্ষণকাল এক

দৃষ্টে চাহিয়া থাকিল বটে; কিন্তু মুখ হইতে একটীও কথা নিঃসৃত হইল না। সাধনার অভাবে রমাকান্ত সংজ্ঞাহীন হইয়াছে তাহার মুখে কথা নাই। সে উন্মত্তভাব ধারণ করিয়াছে, কোমল হৃদয়ে কঠিনের আবির্ভাব হইয়াছে। পাষাণহৃদয় রমাকান্ত চিরজীবনের জন্য প্রিয়তমাকে বিদায় দিতে উপস্থিত হইয়াছে, সহধর্ম্মিণীর সবিশেষ অবস্থা সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছে, তথাপি সময়ে পুনরায় যেন সাদর সম্ভাষণে সাধনা তাহাকে গ্রহণ করিবে, যুবক মনে মনে এরূপ অনুমান করিতেছে; কিন্তু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রমাকান্তের হৃদয়ে সে ভাবের ভাবান্তর হইতে লাগিল। রমাকান্ত সাধনার কষ্টকাপন্ন পীড়া জানিয়াই একমাত্র অনাথ তারণ দেব দেবের শরণাগত হইয়াছিল, কায়মনোবাক্যে গৃহলক্ষ্মীর মঙ্গল কামনা করিয়াছিল, এক্ষণে দৈবও তাহার প্রতিকূল হইতে দেখ জানিতে পারিয়া, সে নয়নাসারে ভাসিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সাধনার কণ্ঠশ্বাস রোধ হইয়া আসিল, তাহার নয়নদ্বয় উন্মীলিত রহিয়াছে বটে; কিন্তু মুখ হইতে একটীও কথা বাহির্গত হইতেছে না, সময়ে সময়ে কণ্ঠনালীর একটু শব্দ হইতেছে মাত্র। পতিপ্রাণা এক দৃষ্টে পতির প্রতি চাহিয়া রহিল, রমাকান্তের পার্শ্ব দেশেই তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতার মুখের প্রতি তাকাইয়া বসিয়াছিল, বালক গর্ভধারিণীর বিকৃত ভাব দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "কেন মা! তুমি কথা কহিতেছ না কেন?" সে সময়ে সাধনার বাক্‌শক্তির এককালে লোপ পাইয়াছে, যুবতী পুত্রের কাতরোক্তিতে একটিও কথা কহিতে পারিল না, উন্মীলিত নেত্রযুগল হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুধারা বিগলিত হইল মাত্র; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে চিরবিচ্ছেদ জন্য হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

জীবনের যত শেষ হইয়া আসিল, সাধনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই যেন এককালে নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িল, সময়ে সময়ে নাভিশ্বাসের বিকাশ মাত্র লক্ষিত হইতে লাগিল। ব্রজেশ্বর বধূমাতার অবস্থা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, শোচনীয় দৃশ্য নয়ন সমক্ষে দেখিতে তাঁহার আর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সংসারের মায়ামোহ বন্ধনে তিনি বিজড়িত রহিয়াছেন, শোকাচ্ছন্ন রমাকান্তের মুখের প্রতি তাকাইয়া তিনি আর অন্তরালে থাকিতে পারিলেন না, পুত্রকে সময় সঙ্গত দুই একটী প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞানহারা রমাকান্ত এক দৃষ্টে পিতার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল।

সাধনার অন্তিম সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিজনবর্গকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, বহুকাল পীড়ার প্রাবল্যে যুবতীর দেহ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, প্রাণপক্ষী ভগ্নপিঞ্জর হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য প্রতিক্ষণেই সুযোগ সন্ধান করিতেছিল। সাধনা সংজ্ঞাহীনা হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনাশক্তি রহিত হইবার ক্ষণকাল বিলম্বেই প্রাণ দেহশূন্য হইল। পরিজনবর্গের বিলাপ ধ্বনিতে রায় মহাশয়ের বাটী শোক মাখা শ্মশান-চিত্র ধারণ করিল। বিচক্ষণ ব্রজেশ্বর অবিলম্বেই বধূমাতার যাহাতে সদ্গতি হয়, তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে শোকাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল, তথাচ তিনি সাধনার সদ্গতি জন্য যথাযথ সুবন্দোবস্তের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সতীদেহ গঙ্গাতটে শ্মশানবক্ষে অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা ধ্বংস করা হইল, পতিপ্রাণা যুবতীর আর চিহ্ন মাত্র রহিল না। এক মাত্র তাহার গুণরাশি পরিবারবর্গের হৃদয়ে যাবজ্জীবনের জন্য প্রস্তর খণ্ডের রেখার ন্যায় অঙ্কিত রহিল।

উপসংহার।

রমাকান্তকে জন্মের মত কাঁদাইয়া সাধনা ইহজীবনে ধিক্কার দিয়া পরলোক গমন করিল! ব্রজেশ্বর, মায়াসুন্দরী ও অন্যান্য পরিবারবর্গ সকলেই জ্যেষ্ঠ বধূর গুণে একান্ত মুগ্ধ ছিলেন, সাধনার অবর্ত্তমানে সকলেরই যেন হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। রমাকান্ত এতদিন সাধনার অবলম্বনে সংসারী ছিল, এক্ষণে গৃহলক্ষ্মী শূন্য হওয়ায় সংসার তাহার পক্ষে বিষময় বোধ হইল। উদ্দেশ্য বিহীন যুবক এক মাত্র সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এত দিন সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে কদাচ বিচলিত হয় নাই, এক্ষণে পদে পদে তাহার বিঘ্ন বিপত্তি সংঘটিত হইতে লাগিল। অপগণ্ড পুত্রকন্যাগণের এখনও জ্ঞান লাভ হয় নাই, তাহাদের নয়ন সমক্ষে যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহারা তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারে নাই। পিতামহ পিতামহী এবং অন্যান্য পরিজনবর্গের আদর যত্নে তাহারা প্রতিপালিত হইতে লাগিল, তাহাদের লালন পালনে ত্রুটি হইল না বটে: কিন্তু তাহাদের মুখ ভাবে অশান্তিভাব প্রকাশ না হইলেও বাহিক আকার প্রকারে চিত্তবৈলক্ষণ্যের সম্পূর্ণ আভাস দেখা দিল।

কৃষ্ণলাল সাধনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, কন্যার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার শরীর একেকালে ভাঙ্গিয়া গেল তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন, ডাক্তার বৈদ্যের চিকিৎসায় তাঁহার রোগের কোন প্রতীকার হইল না, তিনি স্বল্প দিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া কন্যাশোক জনিত অন্তর্জ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অভাগিনী সরলা সুন্দরী পতি ও কন্যা শোকে উন্মাদিনী ভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সুধারাম ভগ্নীকে বড় ভালবাসিত, সাধনার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃদেবের পরলোক গমনে তরুণ যুবকের হৃদয়ে দারুণ শোক শেল বিদ্ধ হইল। অথচ পিতার অবর্ত্তমানে সংসারের সকল ভারই তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে; সুধারাম আশা ভরসা, সুখ সচ্ছন্দ সকল বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া পিতৃ সংসার রক্ষার জন্য অ[illegible]ক্ষাসত্বেও সে গুরুভার বহনে উদ্যোগী হইল। সাধনার শ্বশুরালয় ও পিতৃগৃহ তাহার অভাবে শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সাধনার অবর্ত্তমানে রম[illegible]ন্তের চৈতন্য লাভ হইল, হায়! অভাগা এক দিনের জন্যও সংসারের ভাল মন্দের প্রতি চাহিয়া দেখে নাই, আপনার আমোদ প্র[illegible]দ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, জীবন সঙ্গিনী সাধনাকে হারাইয়া সংসার তাহার পক্ষে যেন অরণ্য স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। আহার বিহার সকল বিষয়েই তাহার অনিচ্ছা জন্মিল, সংসারের প্রতি বীতস্পৃহা হইল; কিন্তু পরক্ষণে মাতৃহারা পুত্র কন্যার মুখের প্রতি তাকাইয়া সে ভাবের ভাবান্তর ঘটিল। চিত্ত বৈকল্য অবস্থায় রমাকান্তের দিন কাটিতে লাগিল, বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ ও পুরনারীগণের প্রবোধ বাক্য কিছুতেই তাহার হৃদয় ব্যথা বিদূরিত না। যত দিন যাইতে লাগিল, রমাকান্ত প্রণয়িনীর বিচ্ছেদ

যন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট বোধ করিতে লাগিল, কিন্তু ভাবনা চিন্তায় শোকের প্রতীকার না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেই লাগিল, রমাকান্ত দিন দিন হতশ্রী হইয়া পড়িল। এখন উপায় কি? উপায়,—

> "ভূল ভূতপূর্ব্ব কথা ভুলে লোক যথা, স্বপ্ন নিদ্রা অবসানে।
> এ চিরবিচ্ছেদে এই হে ঔষধি মাত্র কহিনু তোমারে।"

ব্রজেশ্বর পুত্রের জন্য বিশেষ ভাবিত হইলেন, কিন্তু যতক্ষণ না রমাকান্তের হৃদয় ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদবধি কোন প্রকার উপায়ই করিতে পারিলেন না। সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই রায় মহাশয়ের সংসারের যে শ্রীচাঁদ ঘুচিয়া গেল, তাহা সুদীর্ঘ সময়েও আর পূরণ হইল না।

সমাপ্ত।